জিয়ার নৃশংস হত্যাকান্ড

৪৮ ঘন্টার বিদ্রোহ

রোববার

(পুনর্মুদ্রণ)

[illegible]

জিয়া আর ফিরে আসবেন
তিনি আর বলবেনও না যে
আমি জিয়া বলছি।

বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা

Ahmed
10/6/81

৭ জুন ১৯৮১

মূল্য
৬·৪০

প্যাকেট

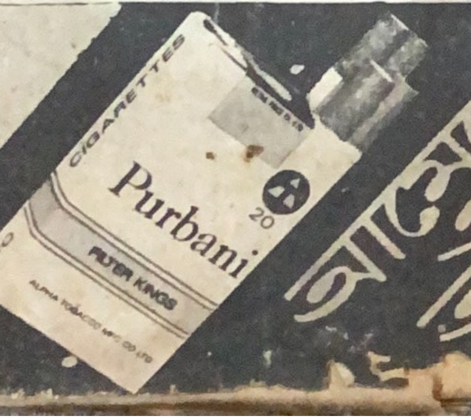
CIGARETTES
Purbani
20
FILTER KINGS
ALPHA TOBACCO MFG CO LTD

আমেজে আনন্দে পূর্বাণী কিংস

রোববার

৭ জুন ১৯৮১ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

তৃতীয় বর্ষ
একচল্লিশতম সংখ্যা

সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলতি সপ্তাহের সম্পাদকীয় লিখছি। কতিপয় চক্রান্তকারীর হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত। আমরা মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার তথা বেগম খালেদা জিয়া, দু'ছেলে ও আত্মীয়স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তরে গণতন্ত্র হত্যার কথাই বলতে চাই। নৃশংস ও ঘৃণ্য হত্যার মাধ্যমে পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের জানা নেই। গণতান্ত্রিক রাজনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ কোথাও কখনো হত্যা সমর্থন করেনি, করে না। এ-প্রসঙ্গে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, যতোদিন পর্যন্ত এই হত্যা ও হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের রাজনীতি চলতে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না; দেশ ও জনগণের কাঙ্ক্ষিত মঙ্গল অর্জিত হবে না।

মরহুম রাষ্ট্রপতি ও তাঁর দেহরক্ষীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত, ঘটনার তদন্ত ও বিচারের উদ্দেশ্যে একটি ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল গঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের, বিশেষত, বিরোধীদলীয় সদস্যবৃন্দ এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় এবং সংসদীয় কমিটি দ্বারা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, সাম্প্রতিক সংকট মোকাবেলা ও সংবিধান রক্ষায় দেশ ও জনগণ সম্মিলিতভাবে সংকল্পবদ্ধ। হত্যার বিকল্পে হত্যা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না—এই প্রত্যয়দৃপ্ত আদর্শ সামনে রেখে জনগণ দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল সামনে এগিয়ে চলবেন। যতো বাধা-বিপত্তিই আসুক, জনগণের বিজয় অনিবার্য ও অবধারিত।

এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের উপর আমাদের সুদীর্ঘ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন নাদিরা মজুমদার, শেখ মহিউদ্দিন, সেলিম নজরুল হক, আনিসুল হক গামা এবং অরিন্দম বণিক। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের ছবিগুলো তুলেছেন নাদিরা মজুমদার।

সম্পাদক
আবদুল হাফিজ

প্রচ্ছদে আলোকচিত্রশিল্পী আনোয়ার হোসেনের
তোলা রঙিন স্বচ্ছচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে

সাজু হোসেন কর্তৃক দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস ইত্তেফাক ভবন
১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য চার টাকা মাত্র

চিঠিপত্র ৪
আশেপাশে ৬ বহির্বিশ্ব ৭
রাজনীতি ৮ অর্থনীতি ৯
৪৮ ঘণ্টার বিদ্রোহ: জিয়ার নৃশংশ হত্যাকাণ্ড ১০ রোববার প্রতিবেদন
গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী ২৯ সৈয়দ তোসারফ আলী
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ (ধারাবহিক নিবন্ধ) ৩২ শওকত মাহমুদ
বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা ৩৩ তাপস মজুমদার
কবিতা ৩৮ নির্মলেন্দু গুণ
চিলেকোঠার সেপাই (ধারাবাহিক উপন্যাস) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
কবি আবদুল কাদিরের সাক্ষাৎকার ৪৪
সাহিত্যের খবর ৪৫
বিজ্ঞান ৪৬
চিত্রকলা ৪৭
ধাঁধা ৪৭
মূকাভিনয় ৪৮ আলিমুজ্জামান
অপর সভ্যতা ৫২
প্রিয়দর্শিনী ৫৪ খেলাধুলা ৫৫
সপ্তাহের খবর ৬১ অপর মানচিত্র ৬৩

চিঠিপত্র

অবহেলিত পায়রাবন্দ

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ একটি আদর্শ গ্রাম। বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মস্থান এই পায়রাবন্দ। আর এ-কারণেই পায়রাবন্দ নামটি ছোট-বড় সবার কাছে সমধিক পরিচিত। আজ থেকে একশ' বছর আগে ইংরেজী মাসের ৯ই ডিসেম্বর এই পায়রাবন্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ঐতিহ্যবাহী গ্রামটি আজো অবহেলিত। পায়রাবন্দ যাওয়ার সুদীর্ঘ তিন মাইল সড়কটি আজো পাকা হয়নি। হয়নি তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে সরকারী পর্যায়ে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো সংস্থা। যদিও বা তাঁর নামকরণে বেসরকারী পর্যায়ে একটি স্কুল এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্যের অভাবে বর্তমানে স্কুলটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সৈয়দ আবুল হাসানাত
লাবলু
নতুন শালবন, রংপুর।

রংপুর শিশু উদ্যানে গোরু চরে

রংপুর শিশু উদ্যান। পাক আমলে কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এ-শিশু উদ্যানটি। বর্তমানে উদ্যানটি শিশুদের কলকাকলীতে মুখরিত হয় না। শিশুরা এখন এখানে এসে খেলাধূলা করে না, আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে না। কেন না উদ্যানটি একটি গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। শহরের একশ্রেণীর টাউট এখানে এসে মদ ও জুয়া খেলায় মেতে থাকে সর্বক্ষণ। এদেরকে বাধা দেয়ার মতো শহরের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কি কোনো ক্ষমতা নেই? জানি না আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কেন বারবার নীরব থাকছেন! উদ্যানটির পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং স্থানীয় বিভিন্ন শিশু সংগঠনের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হয়েছিলো কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজঅবধি আশানুরূপ তেমন কোনো ফল পাওয়া গেলো না।

সৈয়দ আবুল হাসানাত
লাবলু
আহ্বায়ক, চাঁদের হাট,
রংপুর শাখা, রংপুর।

শান্তি গেলো কই

শান্তি গেলো কই? প্রশ্নটা আমার একার নয়, প্রত্যেকেরই। আমার এক বন্ধু কৌতুক করে বলেছিলেন, শান্তি মারা গেছে—কথাটা হাস্যকর মনে হলেও সত্য, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি, নিরাপত্তার অনিশ্চয়তাই সত্যি বলতে কি, আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে শান্তি বলে কিছু নেই। মরীচিকার মতো শান্তি দূরে—বহু দূরে দাঁত বের করে হাসে, হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু কাছে ছুটে গেলে বোঝা যায়, সবই ফাঁকি—শান্তি নেই। শান্তি গেলো কই—এই প্রশ্নের সদুত্তর কি কেউ দিতে পারবেন?

সারওয়ার জান তালুকদার
হামিরদী, পোস্ট: পুকুরিয়া,
ফরিদপুর।

নজরুলের কার্টুন দেখতে চাই

'রোববার' একঘেঁয়েমি হয়ে আসছিলো। হঠাৎ কার্টুনিষ্ট নজরুলের অপূর্ব কার্টুন 'রোববার'-এ বৈচিত্র্য আনতে শুরু করেছে। অনেক দিন আগে অবশ্য রোববারে কার্টুনিষ্ট নজরুলের কার্টুন দেখেছি। ১৯৭৯ সালে ব্রেজনেভ-কার্টারের সল্ট (SALT) চুক্তির ওপর কার্টুনটা আজও রস-পিপাসা মেটায়। যাহোক, নিয়মিত নজরুলের কার্টুন চাই। তিনি আবার হারিয়ে যাবেন না তো? আমি মনে করি, কার্টুনিষ্ট হিশেবে নজরুল এই পঙ্গুসমাজের একটা এ্যাসেট।

নজরুলের ঠিকানা জানালে কৃতজ্ঞ হবো। ধন্যবাদ।

লাইলি
৮৬/১, আরামবাগ, ঢাকা।

ইন্টার্নীদের যোগ্যতা

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইন সার্ভিস ট্রেনী ডাক্তাররা ট্রেনিংশেষে দেশের বিভিন্ন হেলথ কমপ্লেক্সে চলে গেছেন। নতুন ইন্টার্নী ডাক্তারদের আসতে প্রায় ছ'মাস বাকি। এর ফলে গোটা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ড চালু না হওয়ায় সার্জারী ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনাও দারুণ সংকটে নিমজ্জিত। তাই শেষবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্জারী ওয়ার্ডে ডিউটি দিতে হচ্ছে অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে। টিচিং হাসপাতালগুলোর সিংহভাগ চিকিৎসার দায়িত্বে থাকেন এই নবীন ইন সার্ভিস ট্রেনী ডাক্তাররা। আশাকরি ভবিষ্যতেও ইন সার্ভিস ট্রেনী ডাক্তারদের বেতন ও পদমর্যাদার ব্যাপারে কোনো মহলের দ্বিমতের অবকাশ যেন না রাখা হয়।

শাহাবুদ্দিন
শেষ বর্ষ এম. বি, বি, এস
রংপুর মেডিক্যাল কলেজ।

বিনামূল্যে গ্রহরত্ন!

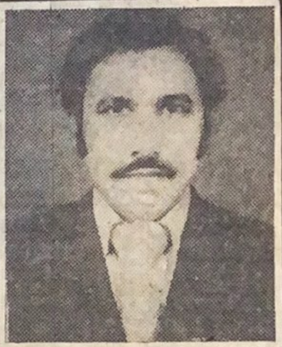

বাংলাদেশ নক্ষত্র ও হস্তরেখা বিজ্ঞান ফেডারেশনের ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশ ডিগ্রীকলেজ অব এ্যাস্ট্রোলজী এ্যাণ্ড অকাল্ট সায়েন্সের অধ্যক্ষ **প্রফেসর হাওলাদার** এম. এ, (ইং) এল, এল, বি, এস, সি, এফ, এস (আই, এস, আর, টি,) এ, এম, এ, এফ, এ. (আমেরিকা) কর্তৃক বিভিন্ন রোগমুক্তি এবং অশুভ গ্রহের জন্য যে সমস্ত মূল্যবান "রত্নের (পাথর)" ব্যবস্থাপত্র দিবেন সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের লোকদেরকে ঐ সব মূল্যবান পাথর ঐ সময়ই বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হইবে।

প্রফেসর হাওলাদারের সঙ্গে
যোগাযোগের ঠিকানা :-
১৮ নূর ম্যানসন, বলাকা সিনেমার
উত্তর পার্শ্বে। ঢাকা—৫,
ফোন : ৩১৮৬৯৩,
সময় : বিকাল ৫টা থেকে ৮টা
শুক্রবার—বন্ধ।

প্রসঙ্গ ঃ ট্রাফিক সমস্যা

'রাজধানীতে ট্রাফিক সমস্যা' শীর্ষক সময়োচিত তথ্যবহুল প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য 'রোববার'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এ-সমস্যাটি শুধুমাত্র রাজধানীতেই নয়, দেশের প্রতিটি জেলায় এ সমস্যাটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় বর্ষ, আটত্রিশতম সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী নাফিজ আহমেদ নাদভীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ট্রাফিক ব্যবস্থার উলঙ্গ মূর্তি তুলে ধরার জন্যে। ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, "রাস্তার ডানদিক দিয়ে যানবাহন চলাচলের আইন কবে থেকে শুরু হলো?" শেষে ট্রাফিক কর্তৃপক্ষকে উপদেশ, "তারিখটা এবং আগে যে বামদিক দিয়ে যানবাহন চলতো, তার একটা মডেল যেন যাদুঘরে রেখে আসেন, যাতে আমাদের বংশধররা জানতে পারে, এ-দেশে কোনো এক সময় রাস্তার বামদিক দিয়ে গাড়ি চলতো।"

জাহাঙ্গীর জাভেদ
২৪, শহীদ মীর্জা লেন
মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গ ঃ অপর মানচিত্র

তৃতীয় বর্ষ উনচল্লিশতম সংখ্যায় 'অপর মানচিত্র' বিভাগটি পড়লাম। একটা দেশ সম্পর্কে অল্পকথায় বিস্তারিত জানার জন্য 'অপর মানচিত্র'-এর প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না, বিশেষ করে বিভাগটি পড়ার-পর আমার এই কথাই মনে হয়েছে। বিভাগটি নিয়মিত চালু থাকলে ছাত্রসমাজসহ ব্যাপক পাঠকসমাজ উপকৃত হবে, সন্দেহ নেই।

মোশারেফ হোসেন
ঘোড়াশাল, ঢাকা।

কবি রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি

গত একুশে মে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানে, পরিচালক সাহেব জনৈক উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের দু'টি কুঠিবাড়ি আছে, যা সরকার সংরক্ষণ করছেন, কুঠিবাড়ি দু'টি কোথায়"? সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কুঠিবাড়ি আছে। একটি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে, একটি পাবনার শাহজাদপুরে ও অপরটি রাজশাহী জেলার আত্রাই থানাধীন নাগর নদীর তীরে পতিসর নামক স্থানে। কবির ছেলের নামানুসারে এখানে 'রথীন্দ্রনাথ হাই স্কুল' এখনও বর্তমান। কবির অনেক কবিতাও এখানেই রচিত। 'তাল গাছ' কবিতাটির কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

গোলামমুর্তাজা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনীতির ওপর প্রতিবেদন চাই

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যায় 'রোববারে' প্রকাশিত শেখ মহিউদ্দিনের "বক্তৃতা বিপ্লবের রাজনীতি" প্রতিবেদনটি পড়লাম। প্রতিবেদনটি আমার খুব ভালো লেগেছে। এজন্য প্রতিবেদককে ধন্যবাদ। রাজনীতির ওপর এ-রকম বিশেষ প্রতিবেদন চাই—এই আশাই রোববার-এর কাছে করছি।

ছানোয়ার হোসেন
কল্লা বাজার, টাঙ্গাইল।

প্রসঙ্গ ঃ উচ্চরক্তচাপ

গত ১৭ই মে '৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আপনি কি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন' প্রতিবেদনটি পড়ে উচ্চরক্তচাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বর্তমান বিশ্বে উচ্চরক্তচাপ একটি প্রকট সমস্যা। উত্তরোত্তর এ-রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে অবশ্য দেখা গেছে বাংলাদেশে এ-রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম। তবুও উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেন না সাধারণ লোক এ-রোগ সম্পর্কে আশানুরূপ সচেতন নন। তাই এ ধরনের একটি লেখা উপহার দেয়ার জন্য রোববার কর্তৃপক্ষ ও প্রতিবেদকদ্বয়কে ধন্যবাদ।

মমতাজ হাসান
কচুবাড়ী, দিনাজপুর।

বি, টি, ভি এবং কিছু কথা

টিভি কর্তৃপক্ষ দর্শকদের মতামত জরিপ করেন। কিন্তু অনুষ্ঠানমালা দেখে মনেই হয় না কর্তৃপক্ষ তাঁদের মতামতকে অনুষ্ঠান বিন্যাসের সময় প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। মনে প্রশ্ন জাগে টিভি'র অনুষ্ঠান কি দর্শকদের জন্যে প্রচারিত হয়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রিটার্ন অব দি সেইন্ট ছবিটি অন্যান্য সিরিজের চেয়ে পছন্দের দিক দিয়ে দর্শকরা প্রথম মনোনীত করলেও এখন প্রদর্শিত হচ্ছে না। তবে বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির উপর সচিত্র তথ্য পরিবেশণের জন্য টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অপ্রিয় সত্য, টিভি ক্রীড়ার প্রতি উদাসীন। ফুটবল লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখানো দূরে থাক খেলার ফলাফল জানাতেও টি, ভি নারাজ। কিন্তু মিনিটে ৬ ডলার খরচ পড়লেও টেনিস খেলা প্রতিদিন খবরে দেখাতে টি, ভি-র আপত্তি নেই।

টিভি কিউতে বাংলা সিনেমার তালিকা দেয়া হয় না। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলোকে বাংলা খবরের পর প্রচার করার দাবি জানানো হয়েছিলো। কিন্তু একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, ছাড়া অন্যান্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানও শুক্রবারের নাটক/যাত্রা আগের নিয়মে প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা, টি, ভি কর্তৃপক্ষ দর্শকদের মতামতকে মূল্য দেবেন।

মনজু
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

STUDY – THE EASY WAY
কিভাবে ভাল ছাত্র হওয়া যায়
ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এম.এ ক্লাস পর্যন্ত সব ধরনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বই
বিদ্যুৎ মিত্রের
সঠিক নিয়মে
লেখাপড়া
মূল্য বার টাকা
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩ সেগুন বাগান
ঢাকা ২
প্রকাশনী
নিকটস্থ বুকস্টলে আজই খোঁজ করুন।

দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা
সর্বপ্রকার জটিল যৌন ব্যাধি
বাত ব্যাধি, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ক্যান্সার, চর্ম্মরোগ ইত্যাদি স্ত্রী-পুরুষের জটিল ও কঠিন রোগের ইউনানী মতে চিকিৎসার জন্য
আপনাকে দেবে সম্পূর্ণ
আরোগ্য লাভের গ্যারান্টি
হাকিমী ঔষধালয়
- ৪৪/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, গোপীবাগ ঢাকা-৩, ফোন: ২৪৪৭১৮/২৫২৬২৬
- ১৮৩, জুবিলী রোড চট্টগ্রাম, ফোন: ২০১৫০১
- মোগলটুলী রোড, কুমিল্লা ফোন: ৬৩৬৬/৬৩৪০/৬০১৫

আশেপাশে

নিজে সবুজ হয়ে বাঁচুন

আজ সোমবার (১-৬-৮১) থেকে আগামী তিন মাস সময়ের মধ্যে যে কোনো একদিন যে কোনো সময় আপনি একটি গাছ লাগাতে পারেন, ফুল কিংবা ফলের। এই গাছটি অবশ্যই কোনো মৌসুমী ফুল কিংবা ফলের গাছ হলে চলবে না, সে-সব তো হর-হামেশাই বোনা যায়। সম্ভবত বুনেও থাকেন। বরং যেসব গাছের স্থায়ীত্ব একটু বেশি, যেগুলোকে বলা যায় বিটপী, যেগুলো বছরের-পর বছর ছায়া দেয়, ফুল দেয়, ফল দেয় আর স্নিগ্ধ-সবুজ হাতছানি মেলে আকাশপানে তাকিয়ে আপনার অস্তিত্বের কথাই ঘোষণা করে—আপনি বরং এ-রকম একটি গাছই রোপণ করুন। তিনমাসব্যাপী বৃক্ষ রোপণের ব্যাপারটাকে মনে রেখে উপরোক্ত কথাবার্তা আপনার কাছে আপাতত স্লোগানধর্মী মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি বলতে কি বর্তমান পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকবার জন্যেই আজকাল আপনার আমার একটি বৃক্ষের বড় প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে প্রতি বর্গমাইলে কম করেও ১৪শ' লোক বসবাস করে। উপমহাদেশের প্রায় ১১ ভাগ লোকের বাস এই বাংলাদেশে, অথচ মোট স্থলভাগের মাত্র তিনভাগ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। ছ'সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের জন্যে দেশে গড়ে আড়াই একর জমিও নেই। গড়পড়তা গ্রামগুলোর ১৩ ভাগেরও বেশি এলাকায় ঘরদোর, ১৫ ভাগ এলাকা পুকুর, ২ ভাগ চারণক্ষেত্র, ১১ ভাগ সব্জিবাগান ও ৫৩ ভাগ এলাকা ফসলী জমি হিশেবে ব্যবহৃত হয়। এই হিশেবে বাগান ও গাছপালা এলাকায় পড়ে মাত্র সাড়ে ৫ ভাগ জমি।

পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা গাছপালা ও বন সৃষ্টিকে অর্থনৈতিক সম্পদ ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রাখার অন্যতম সহায় মনে করেন। জাতিসংঘ আহূত ষ্টক হোম সম্মেলনে ভারত সরকারের রিপোর্টে বনভূমি ১০ ভাগের নিচে নেমে যাওয়াকে বিপজ্জনক, বৃষ্টিপাত হ্রাসের অন্যতম কারণ ও সবুজ স্থলভাগের মরুভূমিকরণ প্রক্রিয়ার শুরু বলে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এ-প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বনভূমি ও গাছপালা উজাড় হওয়ায় ৮০ হাজার বর্গমাইলের রাজস্থান ক্রমশ উষর ও মরুভূমিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে কিছু-কিছু এলাকায় ও উপকূল অঞ্চলে নতুন বন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এ সত্ত্বেও প্রতি দশ বছরে বনের পরিমাণ কমছে ১'১ ভাগ হারে। ১৯৫১ সালে দেশে পৌনে ১৭ ভাগ এলাকায় বন ছিলো। আজ তা কমে ১৫'০৪ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়াকিফহালমহল বলেন: প্রকৃত অবস্থা আরো ভয়াবহ। দেশে ১৩ ভাগ বনভূমি আছে কিনা সন্দেহ। এরও আবার মাত্র ৯ ভাগ এলাকা সরকারী তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। আরো ৯ ভাগ এলাকা তত্ত্ববধানে গুণণের প্রক্রিয়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এ-রকম এক আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষের পরিবেশ সচেতনতা, সক্রিয় উদ্যোগ ও সাহায্য ছাড়া প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তার কারণ, ১৯৬২ সাল থেকে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বাৎসরিক বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়েছে। গত ১৮ বছরে এভাবে প্রায় ৭ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। চলতি অভিযানেই বনবিভাগ থেকে ১ কোটি গাছের চারা ও প্রায় ১২ কোটি বীজ সরবরাহ করার কথা। কিন্তু এসব চারা ও বীজের কতোটা রোপিত হয়, কতো ভাগ বৃক্ষের চারা টিকে থাকে—সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। এ-রকম কোনো পরিসংখ্যান আদৌ না পাওয়া গেলেও তথ্যভিজ্ঞমহল মনে করেন, এর অধিকাংশই যদি টিকে থাকতো, তবে আর বৃক্ষরোপণ অভিযানের প্রায় প্রয়োজনই থাকতো না। সে-জন্যেই আমরা পরিবেশ-প্রকৃতি সংরক্ষণে জনসাধারণর সজ্ঞান-সচেতনতা ও গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতী।

আমরা জানি, দেশের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে, এই যেমন ফরিদপুর, যশোহর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় বনভূমি প্রায় নেই। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী তথা উত্তরবঙ্গে নামমাত্র বনভূমি রয়েছে। সুন্দরবন, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যাও বা বনভূমি অবশিষ্ট আছে, জনসাধারণের অত্যাচারে তাও শেষ হওয়ার পথে। কেন না, ঘরবাড়ির কথা বাদ দিলেও, দেশের মোট জ্বালানির শতকরা ৭৫ ভাগই আসে কাঠখড়ি তথা বনভূমি থেকে। সেই হিশেবে কাঠ ও জ্বালানির প্রয়োজন মেটাতেও বনসৃষ্টি অত্যাবশ্যক।

এসব মিলিয়েই আমাদের আজকের স্লোগান হোক আপনি অন্তত একটি গাছ লাগান। পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষা করুন। নিজে পত্রশোভিত সবুজ হয়ে বাঁচুন।

নাহিদ সালেহ

বহির্বিশ্ব

মাদাম সান ইয়াৎ সেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তাইওয়ানের আত্মীয়রা আমন্ত্রিত

মাদাম সান ইয়াৎ সেন গত ২৯শে মে পিকিংয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ৯০ বছর, মতান্তরে ৮৮ বছর বয়স্কা চীনের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া এই বৃদ্ধা মহিলা অনেক দিন যাবৎ ব্লাডক্যান্সারে ভুগছিলেন। পিকিং বেতারে বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা পার্শ্বে ছিলেন পৌত্রপৌত্রীসহ নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা। ৫ই জুন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর এ-অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য চীন সরকার তাইওয়ানে তাঁর যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং এও বলেছেন যাতায়াতের সকল খরচ পিকিং বহন করবে। এ-ছাড়া তাইওয়ানের কোনো বিমান পিকিং বা সাংহাইয়ের বিমানবন্দরে অবতরণ করতে চাইলে তারও অনুমতি দেয়া হবে।

বলাবাহুল্য, মাদাম সান ইয়াৎ সেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের এই আমন্ত্রণ তাইওয়ান সরকার সহজভাবে গ্রহণ করেনি। আর গ্রহণ যে করবে না তা পিকিং সরকার যে জানতেন না তাও নয়। তবু সম্ভবত রাজনীতির প্রয়োজনে এই শুভেচ্ছামূলক আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। উল্লেখ করতে হয়, ডঃ সান ইয়াৎসেন ছিলেন চীনা রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠিতা। তাঁকে একসময় চীনের জনকও বলা হতো। তাঁর কুয়ো নিন্টাং পার্টি বিদেশী শোষণ-শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। চীনের সর্বজনপ্রিয় এই নেতা আগেই বিবাহিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ৬০/৬২ বছর বয়সের এই নেতার গুণাবলিতে আসক্ত হয়ে পড়েন পিকিং-এর ধনাঢ্য, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের মেয়ে সুং চিং লিং। শোনা যায়, সান ইয়াৎ সেনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি উঁচু দেয়াল টপকে পালিয়ে যান এবং টোকিও গিয়ে ডঃ সানকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ১৯১৪ সালে সেখানেই তাঁদের বিয়ে হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের ওয়েসলীন কলেজ থেকে চিং লিং আগেই গ্রাজুয়েশন নিয়েছিলেন। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৯ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ আবশ্যক, তাঁর ছোট বোন সুং মাই লিং বিয়ে করেন চীনের এককালীন ডিরেক্টর জেনারেল সিমো চিয়াং কাইসেককে। চিয়াং কাইসেক মাও সেতুং-এর সাথে গৃহ যুদ্ধে পরাভূত হয়ে তাইওয়ানে পালিয়ে যান এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চীনের মূল ভূখণ্ড উদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা অব্যাহত রাখেন। চিয়াংকাইসেকেরও এটা দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁর প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র চিয়াং-চিং কুয়ো এখন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট এবং মাইলিং যাঁর বয়স এখন ৮৫ বছর। অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুতরাং চিং লিং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তাঁর বোন তো বটেই, চীন সরকার তাঁর ভাগ্নে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়, ডঃ সান-ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর জেনারেল চিয়াং কাইসেক ক্ষমতায় এসে ডঃ সানের নীতি উপেক্ষা ক'রে চরম দক্ষিণপন্থী নীতি অনুসরণ করেন এবং ক্রমে-ক্রমে মাও সেতুংয়ের কম্যুনিষ্টদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মাও সেতুংয়ের লংমার্চ তাঁর সময়েই ঘটে। অন্যদিকে চীনের গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইসেককে সমর্থন করে এবং ১৯৪৯ সালে তিনি তাইওয়ানে পালিয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সরকারকেই চীনাসরকার বলে গ্রহণ করে। এ-ভাবে মাত্র কয়েক বছর আগেও তাইওয়ান জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী ছিলো। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফর, গণচীনের প্রতি মাকিন স্বীকৃতির পর তাইওয়ান আন্তর্জাতিক সে ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। তবে চীন তাইওয়ানকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করলেও যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের পৃথক সত্তা বহাল রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে এবং এখনো তাইওয়ান যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সাহায্য সমর্থন পেয়ে আসছে। অন্যদিকে চীন তাইওয়ানকে তাৎক্ষণিক জবরদস্তির মাধ্যমে অঙ্গীভূত করাতে চায় না। তারা চাচ্ছে তাইওয়ানের সাথে যোগাযোগ, চিঠির আদান-প্রদান। অর্থাৎ পারস্পরিক আস্থার মাধ্যমে তাইওয়ানবাসীর মন জয় করতে। এমন কি তাইওয়ান চীনের অঙ্গীভূত হলে তাইওয়ানের জীবনযাত্রা ব্যাহত করা হবে না বলেও দু'বছর আগে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাইওয়ান সরকার, এই 'কম্যুনিষ্টদের' সকল আবেদন-নিবেদন ঘৃণাভাবে উপেক্ষা করেছেন।

চীন যে তাইওয়ান দাবি করবে তাতে সন্দেহ কি! হয়তো কোনো একদিন তারা তাইওয়ান দখল করবেও। তবে এখন এ-ব্যাপারে তাদের ধীরে চলো নীতির পশ্চাতে মূলত দু'টি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হয়। এক, মাত্র কয়েক বছর হলো আন্তর্জাতিক সংস্থায় চীন স্বীকৃত আসন গ্রহণ করেছে। আর দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে সীমাহীন গোলযোগ, অন্তর্বিরোধ। এ-সময় তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে কোনো এডভেঞ্চারিজম করা নিজ স্বার্থেই অনুকূল হবেনা। দুই, তাইওয়ানকে তাৎক্ষণিকভাবে চীনের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাইওয়ান ও চীন উভয়েরই ক্ষতি হবে। তাইওয়ানীজদের প্রভাবে চীনের গোলযোগ বাড়তে পারে এবং তাইওয়ানে যে শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তাও ভেঙে পড়তে পারে। সম্ভবত তার চেয়ে চীন চায় তাইওয়ান হংকংয়ের মতো দেশ হোক। অর্থাৎ হংকং যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রা (চীনের মোট বৈদেশিক আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) আয় করে চীনকে দেয় তাইওয়ান বর্তমান অবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে আপাতত সে রকম আয়ই যেন চীন বা পিকিংকে দেয়।

সুতরাং তাইওয়ান যে পিকিংয়ের এই পাতা ফাঁদে পা দেবে না তাই তো স্বাভাবিক। তাই মাদাম সান ইয়াৎসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথেই পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হবে এর কারণও রয়েছে। মাদাম সান স্বামীর মৃত্যুর পর চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে মাও সেতুংকে সমর্থন করতেন এবং মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে ডঃ সানের চিন্তাধারার অনুপূরক বলে ব্যাখ্যা করতেন। অন্যদিকে তিনি সরকারের বহু সম্মানজনক পদ প্রদত্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি চীনের অনারারী প্রেসিডেন্ট (লীও শাও চী'র অপসারণ ও মৃত্যুর পর এ-পদটি খালি ছিলো) পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

পর্যবেক্ষক

রাজনীতি

দুটি মৃত্যু ঃ অভিন্ন শিক্ষা

গত ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। সদা কর্মব্যস্ত মানুষটি ঘুমিয়ে পড়েছেন মৃত্যুর কোলে চিরকালের জন্য। মৃত্যু জীবনের জন্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সাধারণ মানুষের মৃত্যুও নয়। মৃত্যু মাত্রেই বেদনাদায়ক। প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু দেশের সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষকে শোকাভিভূত করেছে, করেছে ভীত-বিহ্বল। অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠেছে সাধারণ মানুষের মন। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পরও কিছু কথা, কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। শেখ সাহেবের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে কথাগুলো আমরা বিভিন্ন সময়ে বলার চেষ্টা করেছি প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই সেই একই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হয়। জানি, কথাগুলো অনেকের কাছে অপ্রিয় মনে হতে পারে। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে তা তুলে ধরতে হবে।

আমরা দেখেছি, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এদেশে বারবার সুবিধাবাদী, চাটুকার এবং ষড়যন্ত্রকারীরাই রাজনীতির আসর সরগরম করে রেখেছে। এবং তারাই এক ব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা সপে দিয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিটিকে বাস্তবতার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সবকিছু ব্যক্তির মুখাপেক্ষী থাকার কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়া অথবা শেখ সাহেবের পক্ষে সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা। এজন্যই দেখা যাচ্ছে, শেখ সাহেব এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতার জন্য উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতার আশেপাশের লোকদের হাতেই নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে দেখতে গেলে শেখ সাহেব এবং জিয়ার আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং বেদনাদায়ক মৃত্যুর জন্য তাঁদের স্ব-স্ব দল, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিদাতা এবং পরামর্শদাতারা কম দায়ী নয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট এবং সরকারী ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকেই এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক কারণে প্রেসিডেন্ট জিয়া অনুসৃত রাজনৈতিক পথ ও পদ্ধতির সমালোচনা করেছি। রাজনৈতিক সিষ্টেমের ওপর সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেছি। জনগণের অধিকারের কথা বলেছি। জনজীবনের সমস্যা-সংকটের মূল কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। সমস্যার সমাধান কোন পথে সম্ভব সে ব্যাপারে আমরা আমাদের অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীকেও কখনও খাটো করে দেখিনি। আমরা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের বিপদ সম্পর্কে তাকে হুঁশিয়ার করেছি। দেশ মহা বিপদের দিকে যাচ্ছে—গত দু'মাস যাবৎ এমন আশঙ্কাও প্রকাশিত হতে দেখেছি। এর আগেও কয়েক দফা কু ব্যর্থ হয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের মাহাত্ম্য এমনই যে নিজের ঘরে কি ঘটছে সবসময় সে খবরও রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রেসিডেন্ট জিয়ার পক্ষেও রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে অঘটন ঘটেই গেছে। জাতিকে আর একবার ভয়ঙ্কর বিভীষিকার কালরাত্রি অতিক্রম করতে হয়েছে। আর এই বিভীষিকাময় মুহূর্তে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী-প্রধান ঐক্যবদ্ধভাবে যে ভূমিকা পালন করেছেন সে ভূমিকা গোটা দেশবাসীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিও ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার সংকল্পে অটল থেকেছে। ফলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়েছে।

সে যাইহোক, জীবদ্দশায় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সঠিক পথে রাখা হলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে সক্ষম হতেন যে, ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনই হত্যা, রক্তপাত এবং উচ্চাভিলাষকে উৎসাহিত করে। আমরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কখনো রক্তপাত চাইনি, আর রক্তপাত হোক এটা কোনো সুস্থ ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না। এই ঘটনায় বেশ কিছু সংখ্যক আর্মি অফিসার, জোয়ান এবং পুলিশ নিহত হয়েছেন। কে কোন্ পক্ষে সেটা বড় কথা নয়। যারা মারা গেছেন তারা দেশেরই সন্তান, আমাদেরই আর্মি, পুলিশের লোক। আমাদের মতো গরীবদেশে একজন সৈনিকের পেছনে জনগণকে যে অর্থ যোগাতে হয় তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। সুতরাং যাঁরা এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের চিন্তা করেন, যাঁরা শোক প্রকাশের মধ্যেই সমস্ত কর্তব্য শেষ মনে না করেন তাদেরকেই আজ অস্ত্রের মাধ্যমে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিয়োগান্ত পরিণতি রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে হবে।

ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকেই আজ হতবিহ্বল। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, জীবদ্দশায় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়া হয়নি। রাজনৈতিক দল হিশেবে বি,এন,পি এই ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা নিবে কিনা জানি না। তবে শেখ সাহেব এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজনীতি বহাল রেখে, অস্ত্রের রাজনীতি, হানাহানির রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে থিওরি আলোচনার দরকার হয় না। যাঁরা বিজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান তাঁদের কাছে সবকিছুই পরিষ্কার। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন এবং যাঁরা সরকারী দল করছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন তাঁরা একবার ভেবে দেখুন, দেশে কি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে না পারলে আমরা যে বিপদ হতে মুক্ত একথা বলা যায় না।

ভাষ্যকার

অর্থনীতি

কাঁচামালের জন্য নতুন বাজার খোঁজাটা অত্যাবশ্যক

পশ্চিমী দুনিয়ার মন্দা আমাদের মতো দেশের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে। সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কাঁচামালের বাজারে। স্বাভাবিকভাবেই মন্দার চাপ পড়ছে উন্নত-দেশের শ্রমজীবী জনতা ও পশ্চাদপদ এবং পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল অনুন্নত দেশসমূহের ওপর। পশ্চাদপদ বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ যা রফতানী করে সেই কাঁচামালের দাম কমে যাচ্ছে। এরফলে বিশেষভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সেইসব দেশ যারা প্রধানত একটি রফতানী পণ্যের ওপর নির্ভর করে। দীর্ঘকাল ধরে এই সব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে। বিশেষত যে দেশের ওপর এই দেশ অতীতে বিশেষভাবে নির্ভরশীল বা যে দেশের অধীন ছিলো সেই দেশের সাথে। কাজেই সেই দেশ বা দেশসমূহ যদি হঠাৎ করে কেনা কমিয়ে দেয় বা কম দামে কেনার দাবি করে তাহলে এই সব দেশ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

আমদের অবস্থাও পূর্বোক্ত পশ্চাদপদ দেশসমূহের অনুরূপ। বলতে গেলে আমাদের রফতানী বাণিজ্য পাটের ওপর নির্ভরশীল। কাঁচাপাট ও পাটজাতদ্রব্য আমাদের প্রধান রফতানী পণ্য। ঐ-বছর এই পণ্যের দাম কমে যাওয়াতে টাকার অংকে আমাদের রফতানী আয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। আগামীবছর এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। দুনিয়াতে কাঁচামালের দাম আরও কমে যাবার আশংকা আছে।

বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলোতে অর্থনীতি শুধু রাষ্ট্রীয়নীতির ওপর নির্ভর করে না, তা বহুলাংশে নির্ভর করে বহুজাতিক সংস্থাসমুহের ওপরে। এরা ক্রমে শক্তিধর হয়ে উঠছে। এরা এতোই শক্তিধর যে এরা সবসময় সরকারীনীতির তোয়াক্কা করে না। তাছাড়া এরা সরকারীনীতি প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের পাটের বাজারে এরাই ক্রেতা। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের গুটিকয় বহুজাতিক সংস্থা পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজেই তাদের পক্ষে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর করছেও তাই।

এই অবস্থায় পড়ে বাংলাদেশসহ পাট উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশ সম্প্রতি কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। পাট উৎপাদনকারী সব দেশ বাজারে উপযুক্ত দামের জন্য এবং পাট রফতানীকারী দেশগুলোর স্বার্থরক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। যতোদুর জানা গেছে তাতে তাঁরা একমতও হয়েছেন। তবে এখনো কিছু মতানৈক্য আছে। আশা করা যায় আগামীতে তা দূর হবে এবং আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা গড়ে উঠবে।

কাঁচামালের ন্যায্য দামের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেকদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছে। বার-বার উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা হয়েছে। উত্তর অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশ এবং দক্ষিণ অর্থ অনুন্নত দেশ। এভাবে—অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশকে এককথায় উত্তর আখ্যা দেয়াটা ঠিক নয়। তবু এভাবেই চলে আসছে। কাজেই আমরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবো। শিগগিরই মেক্সিকো শহরে কাঁচামালের দামের ব্যাপারে আলোচনা হবে। আলোচনা হবে জেনেভাতেও। এসব জায়গায় আলোচনা করে কি লাভ হয় জানি না, কারণ পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশের স্বার্থ এ-প্রশ্নের সাথে জড়িত। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বলা যায়। কাজেই নিজেদের পথ নিজেদেরই দেখতে হবে। আর এ-দিক থেকে বিচার করতে হবে আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা গঠনের প্রস্তাব।

সমস্যা শুধু রফতানী পণ্যের দামের নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে। তা বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। অবশ্য তেলের এই দাম বাড়ার পেছনে একমাত্র ওপেকভুক্ত দেশসমূহের তেলের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটা মূল না। ওপেকভুক্ত দেশসমূহের কাছ থেকে তেল কেনে গুটিকয় অতিকায় পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থা। তারা আন্তর্জাতিক তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের হাতে তেলের মওজুদের পরিমাণও কম নয়। আর এরাই তেলের দাম নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে। তেলের দাম বাড়ার ফলে যে মুনাফা হয় তার বেশির ভাগই পায় এরা।

আমরা তেল আমদানী করি। বর্তমানে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার তেল আমদানী করতে হয়। এর ফলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রফতানী ক'রে যা আয় হয় তার প্রায় সবটুকুই তেল আমদানী করতেই খরচ হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য পণ্য আমদানী করতে হয় ঋণ করে। তেল আমাদের আমদানী করতে হবেই। সেজন্য বছরে হাজার কোটি টাকা বা কাছাকাছি পরিমাণ খরচও হবে। আর এ-কারণেই রফতানী আরো বাড়ানো দরকার। আর এ-দিক থেকেই চাউলের দামের ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। অন্যান্য পণ্য রফতানী করতে আমরা চেষ্টা করবো না এমন নয়, কিন্তু পাটের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

কিন্তু পাটের দাম পাবার জন্য আমাদের চিরায়ত বাজার ছাড়াও নতুন বাজার খুঁজতে হয়। সমস্যাটি সহজ নয়। নানা রাজনৈতিক প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। তবু তা করতে হবে। কিন্তু সেজন্য উদ্যোগ কোথায়?

নাগরিক

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

এই মৃত্যু আকস্মিক সন্দেহ নেই। গত শুক্রবার, দিনগত রাত তিনটা থেকে ৪টার মধ্যে আততায়ীর বন্দুকের গুলী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অবস্থানকারী যে ব্যক্তিটিকে বিদ্ধ করে, তিনি বাংলাদেশের সবচে' ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, দেশের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান জনাব জিয়াউর রহমান। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে রাষ্ট্রপতি জিয়া মারা গেলেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা-মুহূর্তে এই চট্টগ্রামই তৎকালীন মেজর জিয়ার স্বাধীনতা-ঘোষণার গৌরবকে ধারণ করে। সেই চট্টগ্রামই জিয়ার হত্যাকাণ্ডের অকুস্থল। উদয় ও অস্ত, দুই-ই চট্টগ্রামে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্র-বিন্দু। বাংলাদেশে ক্ষমতায় তাঁর প্রবেশ আকস্মিক ঘটনা ও পরিস্থিতির সূত্রে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট একদলীয় শাসনের নায়ক শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনী প্রধানের পদে নিয়োজিত হন। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে আবার ক্ষমতার পরিবর্তন। ঠিক চারদিন পর পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে জেনারেল খালেদ মোশাররফ নিহত হন এবং প্রেসিডেন্ট সায়েম ক্ষমতাসীন

৪৮ ঘন্টার বিদ্রোহ

জিয়ার নৃশংস হত্যাকান্ড

রোববার প্রতিবেদন

হন। অবশ্য সরকারের মূল ক্ষমতা তখন থেকে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে তিনজন ডিসি এম এলের হাতে এবং ডিসি এম এলদের অন্যতম সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াই কার্যত ক্ষমতার প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হন। পরবর্তী সময়ে জিয়া নিজেকে প্রধান সামরিক প্রশাসক রূপে ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট হিশেবে শপথ নেন জেনারেল জিয়া। ১৯৭৮ সালের ১২ই জুন জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট হিশেবে তিনি শপথ নেন। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করেন। পার্লামেন্ট কার্যত হয়ে দাঁড়ায় অনুবর্তী। অবশ্য সরকারীভাবে বলা হয় যে পার্লামেন্ট সার্বভৌম।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সুনাম ছিলো একজন ধীরস্থির প্রশাসক হিশেবে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর আমলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। বাকশাল না জিয়া,—এই প্রশ্নে জিয়ার দিকেই ছিলো জনপ্রিয়তার পাল্লা। অবশ্য এই জনপ্রিয়তা কার্যত স্থায়ী হয় ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। এরপর রাষ্ট্রপতি জিয়ার সুনামে কালি পড়তে শুরু করে। অনেকের মতে সরকারী দল বি,এন,পি'ই এর মূল কারণ। প্রায় বাকশালের অনুকরণে বি,এন,পি'কে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র ঢুকিয়ে দিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের চেষ্টার ফলেই দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। আবার কোনো-কোনো মহল মনে করেন, যে শাসন কাঠামো দেশের প্রকৃত ক্ষমতা কার্যত এক-ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়, সেই শাসন কাঠামো দেশের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে না। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মে পর্যন্ত দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক স্থবিরতা ও সামাজিক অস্থিরতার মূলে রয়েছে এই বাস্তবতা।

ব্যক্তি হিশেবে জিয়াউর রহমানের সততার একটি সুনাম লোকের মুখে-মুখে ফিরতো। তবে যেহেতু পাওয়ার ষ্ট্রাকচার ছিলো এক ব্যক্তি-কেন্দ্রীক, সেহেতু দেশে একটা অরাজক কিছু ঘটলেই লোকের কাছে টার্গেটে পরিণত হতো স্বয়ং রাষ্ট্র-

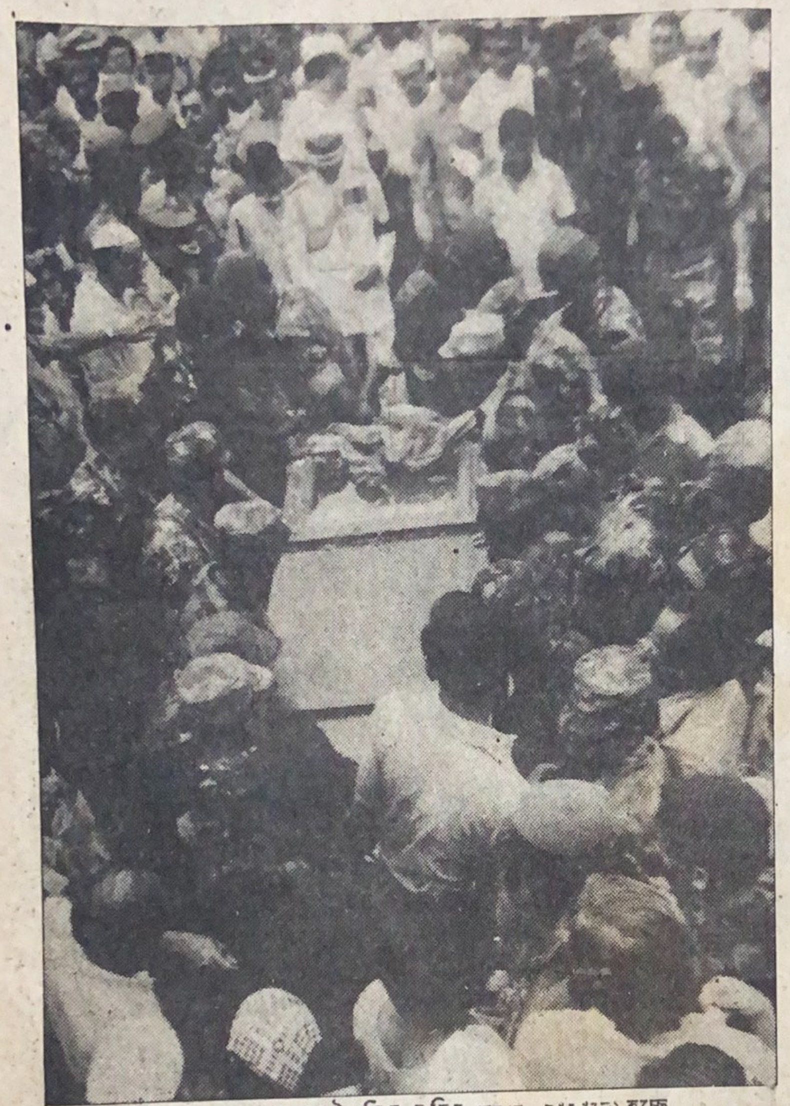

মরহুম রাষ্ট্রপতির কফিন কবরে নামানো হচ্ছে

পতি। জিয়াউর রহমানের প্রশ্নাতীত ব্যক্তিগত সততার অজস্র প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এইকারণে মাঝে-মধ্যেই রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে যে জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগতভাবে এতো সৎ, তাহলে নিজের দু' দু'টি নির্বাচনের জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েক কোটি টাকা তিনি কোত্থেকে পেয়েছেন?

অবশ্য রাজনৈতিক পর্যায়ে এ-ধরনের প্রশ্ন থাকলেও দেশের রাজনৈতিক শিবির থেকে তাঁর ক্ষমতা কোনোদিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি। অনেকের মতে, জিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে গোপনে প্রশ্রয় ও সাশ্রয় জুগিয়ে তাদের কার্য-ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে সমর্থ হন। কোনো-কোনো আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও নিজের রাজনৈতিক প্রয়োজনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। ক্ষমতার রাজনীতি কি বস্তু তা জিয়া যতোটা জানতেন ও বুঝতেন, সেটা বিরোধী রাজনৈতিক দলের বাঘা-বাঘা নেতারাও জানতেন-বুঝতেন কিনা, এ নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই সন্দেহ করা চলে। অনেকের মতে, প্রাসাদ রাজনীতির বিশারদ ছিলেন জিয়া এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ বাংলাদেশে কেউ ছিলেন না।

পাওয়ার-স্ট্রাকচারই কি জিয়ার মৃত্যুর কারণ?

অনেকেরই এই প্রশ্ন। পাওয়ার-স্ট্রাকচারই কি জিয়ার মৃত্যুর কারণ? জানামতে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতারোহণের পর থেকে অপূর্ব সতেরোটি অসফল অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রতিটি অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টারই টার্গেট ছিলেন জেনারেল জিয়া। ক্ষমতায় স্থিত একজনকে সরিয়ে দিতে পারলে বা খতম করতে পারলেই যখন ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে যেতে পারে, তখন এহেন প্রচেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্ষমতা যেস্থলে পদ্ধতিগত উপায়ে বহু'র হাতে ন্যস্ত, সেস্থলে ক্ষমতাসীন এক জনকে সরিয়েও বা মেরেও ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের পাওয়ার-স্ট্রাকচার ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর এক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং তখন থেকেই ঘটেছে ক্ষমতার আপেলটি পাওয়ার আশায় একের পর এক ব্যর্থ বা সকল অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগেই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বাতাসে এই সংবাদ গুঞ্জরিত হচ্ছিলো যে শিগগিরই বাংলাদেশে কোনো ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, ঘটতে চলেছে। অবশ্য বাতাসের গুঞ্জন ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। আসা উচিতও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই গুঞ্জনকেই সত্যে প্রতিপন্ন করলো।

জিয়ার স্মৃতি

জিয়াউর রহমানের স্মৃতি বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে সহজে মুছবার নয়। এক কর্ম-চঞ্চল জেনারেল পায়ে হেঁটে, হেলিকপ্টারে করে, ট্রেনে চেপে বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছেন, মানুষকে বলছেন, খালকাটার কর্মসূচীতে অংশ নিতে, খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের ফেরাতে,—এই স্মৃতি মানুষের মনে বহুদিন জাগরূক

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জে: ওসমানীসহ তিন বাহিনী প্রধান মরহুম রাষ্ট্রপতির মাজার জিয়ারত করছেন

থাকবে। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি নৃশংসভাবে ক্ষমতার গোপন লড়াইয়ে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, এই দুঃখও ভুলবার নয়। জিয়া'র স্মৃতি সামনে রেখেই অনেকেরই আন্তরিক উচ্চারণ এই যে আর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই ক্ষমতার গোপন লড়াই প্রতিরোধের সক্ষম উপায়। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ণ গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন সম্ভব করেই রোধ করা যায় আগামীতে দেশপ্রেমিক নেতাদের নৃশংস ও মর্মান্তিক পরিণতি।

ঢাকা-চট্টগ্রামগামী মেইল গত শনিবার ৩০শে মে সকালে ঢাকা এসেছিলো। রোববার দিন মেইল চলেনি। চললো সোমবার দিন রাত সাড়ে দশটায়। সোমবার দিন সকালেই জানা গেলো যে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার নায়ক মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর আত্মসমর্পণ করেছে।

এই খবর প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে দু'দিনের জন্য বন্ধ হয়ে থাকা ঢাকা-চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম-ঢাকাগামী বাস, রেল, ট্রাক ইত্যাদি চালু হলো। আমরা সোমবার রাত সাড়ে দশটার মেইলে রওয়ানা হই চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। ট্রেন প্রায় ফাঁকা; যা রেলওয়ের জীবনে বিরল ঘটনা। ট্রেন ছুটছিলো মোটামুটি ধীরগতিতে। এর বোধহয় প্রয়োজন ছিলো। রেললাইনের অবস্থা কি কারো জানা নেই। তাই সীমাহীন উদ্বেগ।

প্রায় সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রাম ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখলাম কর্মব্যস্ত শহর। ষ্টেশন থেকে রিক্শা করে শহরের দিকে আসতে নজরে পড়লো প্রতিটি বাড়ি, দোকান, অফিস-আদালতে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা উড়ছে।

চট্টগ্রামে আমাদের প্রথম আলাপ হয় চট্টগ্রামের জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তিনি অনেক কিছু বললেন যার অধিকাংশই সংবাদপত্রে ইত্যবসরে ছাপা হয়েছে। আরো বললেন, ৩১শে মে রোববার দিন জেনারেল মঞ্জুর জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠক শেষ হয়েছিলো বেলা ১২টা নাগাদ। এরপর মঞ্জুর ক্যান্টনমেন্টে ফিরতে পারেননি।

এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের মতে, রাষ্ট্র-

বেগম জিয়া ও পুত্র আরাফাত রাষ্ট্রপতির মাজারে জেয়ারত করছেন

পাত এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ ও কর্নেল আহসানের মৃতদেহ নিয়ে মঞ্জুর বোধহয় সমস্যায় পড়েছিলেন। জীপের পেছনে লাশগুলো নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। এবং শেষতক গুটিকয় গরীব লোকের সাহায্যে লাশগুলো কবর দেয়ার ব্যবস্থা করেন। শহর থেকে অনেক দূরে, ১৮ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ায় প্রকৌশল কলেজের পাশের পাহাড়ের ঢালু পাদদেশে তিনটি লাশ চাপা দেয়া হয়। চাপা দেয়ার আগে লাশের জানাজা নামাজ পড়ানো হয়। অন্য এক সূত্র [ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র] জানায়, রাষ্ট্রপতি জিয়াকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়।

২৯শে মে চট্টগ্রামে জিয়া

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৯শে মে চট্টগ্রাম আসেন দু'দিনের সফরে। তাঁর এই সফর ছিলো। অনেকের মতে, বি,এন, পি'র আভ্যন্তরীণ কোন্দল মীমাংসার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে বিএনপি'র সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীও ছিলেন। ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১৬ জন, কর্নেল এহসান, ক্যাপ্টেন হাফিজ, একান্ত সচিব কর্নেল মাহফুজ। উঠেছিলেন সার্কিট হাউজে। এ-ছাড়াও সার্কিট হাউজে ছিলেন জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মহিবুল হাসান। মহিলা বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী ৬৫ বছর বয়স্কা ডঃ আমেনা রহমান।

২৯শে মে, শুক্রবার। রাষ্ট্রপতি জিয়া সদলবলে এসে নামলেন বিমানবন্দরে। জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। এলেন না শুধু একজন—মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর ; ২৯শে মে রাষ্ট্রপতিকে অর্ভ্যর্থনা জানাতে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি সদলবলে এলেন সার্কিট হাউজে। দলীয় কোন্দল নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিং-এ বসেন। জেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা—যাঁরা প্রোটোকলের দায়-দায়িত্ব পালন করছিলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁদের বলেন, সার্কিট হাউজে অপেক্ষা করার দরকার নেই। তবু তাঁরা ছিলেন।

দাফন শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও দূতাবাসসমূহ পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিংয়ের পর রাষ্ট্রপতি জুমার নামাজ পড়েন চন্দ্রপুরা মসজিদে এবং আমানত শাহ্‌র দরগা জিয়ারত করেন। বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত মিটিং করেন বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় সাংবাদিক, এডভোকেট এঁদের সঙ্গে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যও ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁর দলে যে 'কিছু' বাজে লোক রয়েছে তাদের খুঁজে বের করা এবং বহিষ্কারের কথা বলেন। মুদ্রাস্ফীতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলেন।

এই দু'টি মিটিং জিয়া করেছিলেন সার্কিট হাউজের অডিটোরিয়ামে। সারাদিনের মধ্যে জুমার নামাজ পড়া এবং আমানত শাহ'র দরগা জিয়ারতের জন্য একবার মাত্র বাইরে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যাননি।

'রাত ১-২০ মিনিট পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলাম'

জনৈক দায়িত্বশীল মুখপাত্রের কাছ থেকে জানা গেলো, তিনি ২৯শে মে সারাদিন এবং রাত ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন। মাঝখানে জুমার নামাজের সময় ছিলেন না। ঐদিন রাষ্ট্রপতি কাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, দায়িত্বশীল মুখপাত্রটির তাদের সঠিক পরিচয় জানা নেই।

সে রাতে ১২টার পর চট্টগ্রামে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। মুখপাত্রটি রাত ১টা ২০ মিনিটে বাসায় চলে আসেন। পরদিনই ভোর ছ'টায় তাঁকে বিমানবন্দরে আসতে হবে ; রাষ্ট্রপতিকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে। তাই বাসায় ফিরে তিনি না-ঘুমানোই মনস্থ করেন। কারণ, ঘুমাতে-ঘুমাতে ২টা ২॥টা বাজবে। ফলে, ভোর ঠিক ছ'টায় বিমানবন্দরে হাজির হ'তে পারবেন না তিনি।

রাত আনুমানিক ৩টা ৪৫ মিনিটে তিনি পর-পর কয়েকটা বিকট শব্দে চমকে ওঠেন। মর্টার দাগার শব্দ। তাঁর বাড়ি সার্কিট হাউজ থেকে বেশি দূরে নয়। এরপরই শুরু হলো মেশিন গানের বুলেট বৃষ্টি।

সার্কিট হাউজের কাছাকাছি এলাকায় বসবাসরত পরিচিতরা কয়েকটা বিকট শব্দের পর বুলেট বৃষ্টির আওয়াজে জেগে ওঠেন এবং তাঁকে ফোন করেন। তিনি ছ'টা ফোন কল পান পরিচিতদের। সবারই জিজ্ঞাস্য ছিলো, শব্দটা সার্কিট হাউজের দিক থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে। সেখানে কি ঘটছে ? শেষ ফোন কলটি ক্রসকানেকশন হয়। এরপরই টেলিফোন ডেড হয়ে যায়। তখন ভোর ৪টা ২২/২৩ মিনিট।

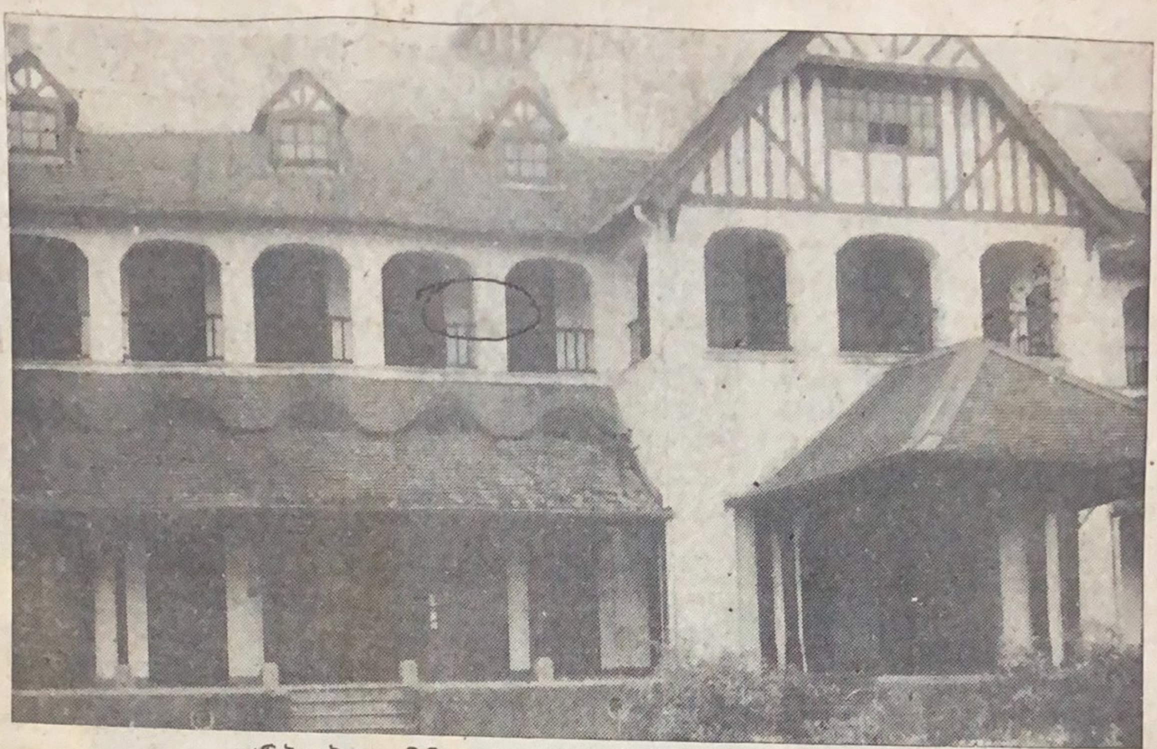

সার্কিট হাউজ : চিহ্নিত স্থানে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়া অবস্থান করেছিলেন

পরদিন সকালের সার্কিট হাউজ

৩০শে মে, শনিবার রাষ্ট্রপতি জিয়া ঢাকা ফিরে আসবেন, সকালে দায়িত্বশীল মুখপাত্রটি সকাল ছ'টায় সার্কিট হাউজে হাজির থাকার জন্য রওয়ানা দিলেন। সার্কিট হাউজে ঠিক ছ'টায় এসে বিমূঢ়। চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা দরজা, জানালা, কাঁচ, টুপি, কিছু বুলেট। স্পষ্টত বুলেটের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে সার্কিট হাউজে।

সার্কিট হাউজে ইত্যবসরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত সব কর্মকর্তাই উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে আছেন কমিশনার, মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার, ডিসি। দোতলায় রাষ্ট্রপতি যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের চৌ-কাঠের বাইরে ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে পড়ে আছে জিয়ার রক্তাপ্লুত দেহ।

এখন কি করবেন তাঁরা?

কমিশনার কিছুক্ষণ সার্কিট হাউজে রইলেন। বাকিরা সার্কিট হাউজ ছেড়ে চলে গেলেন, ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি-না চেষ্টা করার জন্য। তাছাড়া সেই অবস্থায় সার্কিট হাউজে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদও ছিলো না। আততায়ীদল রাষ্ট্রপতির লাশের জন্য যে-কোনো সময় আবার আসতে পারে। তদুপরি ঢাকার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে সেই আত্মবিহ্বল অবস্থায় তাঁদের কিছু করার ছিলো না।

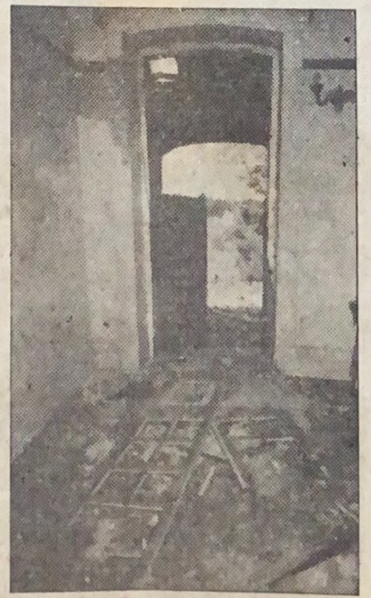

গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত বসার ঘর

মুখপাত্রটি ৮টা ৩০মিনিট পর্যন্ত সার্কিট হাউজে ছিলেন। সেখান থেকে সোজা চলে আসেন অফিসে। তখনো রাষ্ট্রপতি জিয়ার নিহত হবার খবর প্রচারিত হয়নি। যথাসময়ে সবাই এসেছে অফিসে। ১১টার দিকে জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে জনাদশেক সামরিক লোকজন এসে জিয়া এবং কর্ণেল এহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ নিয়ে যায়।

রাত দেড়টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত

সেদিন রাত ১টার পর চট্টগ্রামে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। রাত সাড়ে বারোটা থেকে ১ টা পর্যন্ত কর্নেল মাহফুজ, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব আমিনুর রহমান, কর্নেল আহসান প্রমুখরা কফি খান। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর যে যার ঘরে চলে আসেন ঘুমাতে। রাত ৩-৪৫মিনিটের দিকে ভারি গোলাগুলীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। প্রাণভয়ে তাঁরা যে যার খাটের নিচে লুকিয়ে পড়েন।

মিনিট পাঁচেক প্রচণ্ড গোলাগুলী চলে। আধ মিনিটের বিরতি। এ-সময়ে ভারি বুটের শব্দ শোনা গেলো। আধ-মিনিটের বিরতির পর আবার গোলাগুলী শুরু হয়। এবারে ৩ থেকে ৫ মিনিট গোলাগুলী হয়। এরপর সব চুপচাপ। চারটার. পরে গার্ড রেজিমেন্টের একজন সিপাই খালি পায়ে এসে আমিনুর রহমানকে জানালো, রাষ্ট্রপতি মারা গেছেন। আমিনুর রহমান ছুটে আসেন ৪ নম্বর ঘরের দিকে। এসেই দেখলেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃতদেহ পড়ে আছে অর্ধ-উপুড় অবস্থায়। ডানহাত উপরে ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে। বাঁ হাত পেছনে: শরীরের ডানদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শরীর ইত্যবসরেই শক্ত হয়ে গেছে। তিনি দোয়া-কালাম পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়লো, রাষ্ট্রপতির বাঁ চোখ কোটর থেকে ছিটকে বের হয়ে পড়ে আছে। এটা দেখে আমিনুর রহমান বিকট চিৎকার করে ওঠেন। গার্ড রেজিমেন্টের সেই সিপাইটি বলে ওঠে, 'চেঁচাবেন না, স্যার; ওদের কেউ থাকতে পারে।'

রাষ্ট্রপতির ঘরের উল্টোদিকের ঘরে ছিলেন অধ্যাপক চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মুহিবুল হাসান।

তাঁদের বের হয়ে আসার জন্যে ডাকাডাকি করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। তখন রাষ্ট্রপতির ঘর থেকে ইন্টারকমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট পর অধ্যাপক চৌধুরী বের হয়ে আসেন।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু সংবাদ ঢাকায় কিভাবে ঘোষণা করা হবে এবং রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির অতিকাছের একজন অধ্যাপক চৌধুরীকে অনুরোধ করেন।

ঘটনার এই পর্বটি ঘটে সকাল ৫টার দিকে। সার্কিট হাউজ থেকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ক্যান্টনমেন্টে লাইন চাওয়া হয়। লাইন না পেয়ে এস টিভিতে বঙ্গভবনের সঙ্গে

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশন পান।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ফার্ষ্ট ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী কমাণ্ডার এবং লাহোরের খেমখারান সেক্টরে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কাবুলস্থ পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি কোয়েটা ষ্টাফ কলেজে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে নবগঠিত অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর সামরিক অভিযান শুরু করলে তিনি স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষাবলম্বন করেন।

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় একটি ব্রিগেডের কমাণ্ডার হিশেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালের জুনে তাঁকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তিনি সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহে জিয়া উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ঐ দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জাতীয় সংসদের ৩শ' আসনের মধ্যে ২২০টি আসন লাভ করে। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশ থেকে সামরিক আইন ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া লণ্ডন ও লুসাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, সিডনীতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্র প্রধানদের আঞ্চলিক সম্মেলন, কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেন এবং সৌদী আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, জাপান, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, মালী, সেনেগাল, গিনি এবং পশ্চিম জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় সফর করেন।

১৯৮০ সালের ২৬শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি জিয়া জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ইসলামী সম্মেলনের তিন সদস্যবিশিষ্ট 'আল কুদুস' কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের প্রচেষ্টায় ইসলামী সম্মেলনে গঠিত ৯ সদস্যের শান্তি মিশনে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একাই তেহরান ও বাগদাদ সফর করেন।

যোগাযোগ করা হয়। রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টার পাঠাতে বলা হয়। হেলিকপ্টার পাঠানো হচ্ছে জানিয়ে টেলিফোনের কথাবার্তা শেষ হয়।

সকাল ছ'টার দিকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার কিছু পুলিশসহ সাকিট হাউজে আসেন। জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারাও আসেন। সবাই হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সময় বয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কপ্টার আসছে না। তখন সময় সোয়া ৭টা হবে—অধ্যাপক চৌধুরী বিএনপি অফিসে যাবেন বলে ডিসি'র কাছে গাড়ি চান। ডিসি তাঁকে একটা গাড়ি নিয়ে যেতে বলে দোতলার দিকে উঠে আসেন।

কোন্ গাড়িটা নেবেন বুঝতে না পেরে অধ্যাপক চৌধুরী ও সৈয়দ মহিবুল হাসান খালি পায়ে, আলুথালু পোশাকে হেঁটেই রওনা হন।

আমিনুর রহমান এর মধ্যেই কমিশনারকে একটা গাড়ি দিতে বলেন। কপ্টার আসছে না এবং যে কোনো সময় ঘটনা সংঘটনকারীরা আবারো আসতে পারে বলে সবাই সাকিট হাউজ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অধ্যাপক চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গী হেঁটে চলে যাচ্ছেন দেখে ডিসি তাঁদের জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেন। ৮টার দিকে দু'ট্রাক ভর্তি মিলিটারী সাকিট হাউজের পাশ দিয়ে চলে যায়।

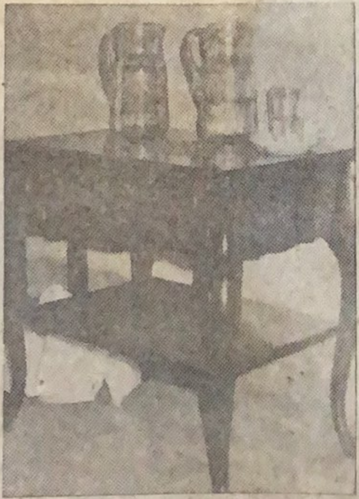

পানি খেয়েছিলেন যে গ্লাসে

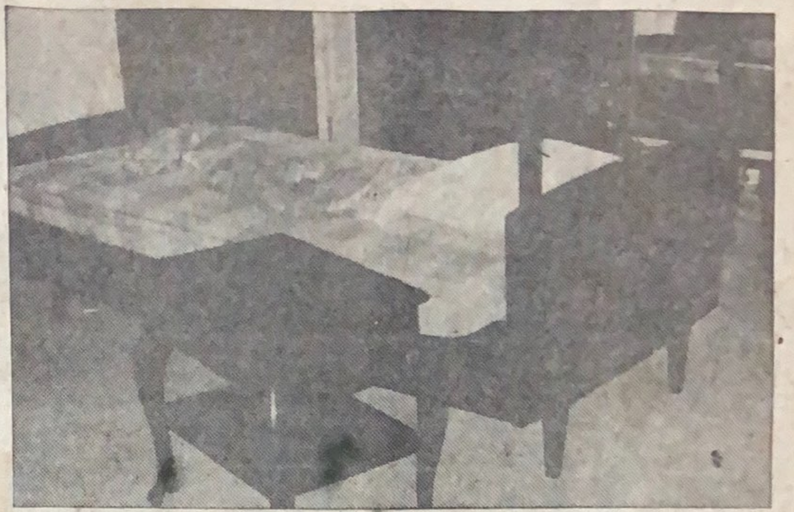

রাষ্ট্রপতির বিছানার চাদর কই ?

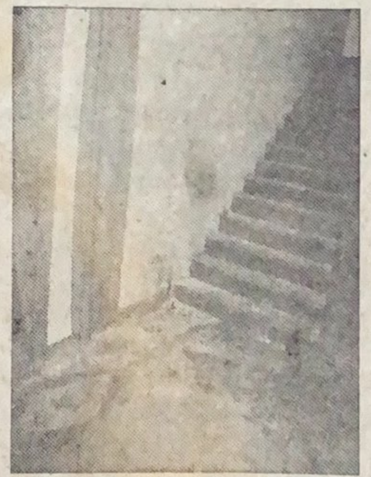

সিড়ির গোড়ায় পড়ে ছিল রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ

কর্নেল মাহফুজ ও রাষ্ট্রপতির মেডিক্যাল অফিসার চট্টগ্রামের কমিশনারের বাড়িতে চলে আসেন। কমিশনারের বাড়ি থেকে ১১টার দিকে তাঁদেরকে আর্মি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানেই তারা আত্মসমর্পণের আগমুহূর্ত পর্যন্ত বন্দী ছিলেন।

এভাবে সাকিট হাউজ সকাল ৮-টার মধ্যে জনশূন্য হয়ে যায়। বাইরে শুধু থাকে পুলিশের প্রহরা। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, সকাল ৮টা ৩০/৪৫ মিনিটে একটা মাইক্রোবাস, একটা জীপ ও একটা পিক-আপ সাকিট হাউজে প্রবেশ করে। মাইক্রোবাসে ছিলো ৪/৫ জন, জীপে আনুমানিক ১০ জন এবং পিক-আপে শুধুমাত্র ড্রাইভার। এরা প্রহরারত পুলিশকে কিছু বলেননি। অনুমান করা হয়, পিক-আপে করেই রাষ্ট্রপতি এবং কর্নেল আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের মৃতদেহ সরিয়ে নেয়া হয়। জানা গেছে যে, এই মোটরযান তিনটি ৪৮ ঘন্টার অবরুদ্ধ চট্টগ্রামে ঘোরাঘুরি করেছে।

সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে দু'ট্রাক ভর্তি সৈন্য সাকিট হাউজে আসে। এই বিদ্রোহী সৈন্যদের দখলেই ছিলো চট্টগ্রাম, ৪৮ ঘন্টার জন্য।

৪নং ঘরের সামনে এই চেয়ারে বসেছিল একজন প্রহরী যে সেরাতে মারা যায়

কালরাত্রির সাক্ষী সার্কিট হাউজ

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ। বৃটিশ আমলে একসময় ছিলো অস্ত্রাগার। ১৯৩০-এ চট্টগ্রামের বীরসন্তান মাষ্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগারটি লুণ্ঠিত হয়। এই লুণ্ঠনের পেছনে আদর্শ ছিলো দেশপ্রেম। বিদেশী বেনিয়া শাসক ও শোষকদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করা। পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকারের অস্ত্রগারটিই সার্কিট হাউজে রূপান্তরিত করা হয়। পরিণত হয় ভিআইপিদের সংক্ষিপ্ত সময়ের বাসস্থানে। একান্নবছর পরে একই বাসভবনে ঘটলো নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

গুলিতে আহত পুলিশ স্বপন

সার্কিট হাউজ। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য ভিআইপি চট্টগ্রামে এলেই সার্কিট হাউজে ওঠেন। একমাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ ১০ই মে'র পর ২৯শে মে রাষ্ট্রপতি দু'দিনের সফরে সার্কিট হাউজের ৪ নম্বর ঘরের বাসিন্দা হন। ৩০শে মে-র কালরাত্রির পর সার্কিট হাউজ কেমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে? দায়িত্বশীল মুখপাত্রটি বললেন, সার্কিট হাউজটিকে ৩০শে মে'র ঘটনার অব্যবহিত পরের অবস্থায় রাখার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। কারণ, জনতা।

পুলিশের কড়া পাহারা অগ্রাহ্য করে হাজার-হাজার অগুনতি জনতা সার্কিট হাউজ দেখার জন্য ঢুকে পড়ে ভেতরে।

একতলার পিলারের কাছে নিহত দুলালের রক্তের ছাপ

ডিসি আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, সার্কিট হাউজে এখন শুধুমাত্র সাংবাদিক এবং প্রেস ফটোগ্রাফারদেরই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে। সাধারণ লোকদের দেয়া হচ্ছে না। ২রা জুন বেলা ৩টার দিকে গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। অগুনতি মানুষ ভেতরে ঢুকতে না পেরে সার্কিট হাউজের নিচু শিকের দেয়াল ধরে বাইরে থেকে তাকিয়ে আছে সার্কিট হাউজের ভেতরের দিকে। সার্কিট হাউজে ঢোকার সময় হাতের বাঁ দিকে নিচু জমিতে ১০/১২টি তাবু গাড়া। সেখানে থাকে বিদ্যুৎ সংস্থার শ্রমিকরা। সে রাতেও ছিলো তারা। গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে পালিয়ে যায়।

সার্কিট হাউজে ঢুকতে হাতের ডানদিকে পড়ে ফুলের বাগান, বাঁ দিক প্রশস্ত লন। ফুলের বাগান ও লনের মাঝখান দিয়ে পীচঢালা রাস্তা এসে শেষ হয়েছে সার্কিট হাউজের গাড়িবারান্দায়।

পীচঢালা রাস্তা ধরে এগুচ্ছি। রাষ্ট্রপতি দোতলার যে ঘরে ছিলেন, সেই বরাবর নিচের রাস্তায় ভাঙা কাঁচ, কাঠের দরজা, জানালার ভাঙা অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে থেমে সামনের দিকে তাকাতেই

নিহত কয়েকজন

ক্যুতে সম্পর্কিত থাকার অভিযোগে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন

যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা হলেন, ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন আহমেদ, কর্ণেল নওয়াজেশউদ্দিন, কর্ণেল আবছর রশীদ, লেঃ কঃ দেলোয়ার হোসেন, লেঃ কঃ ফজলে হোসেন (আহত), মেজর রেজা, মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী, মেজর ফজলুল হক, মেজর মজিবুর রহমান, মেজর রওশন ইয়াজদানী, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার, ক্যাপ্টেন গিয়াস, ক্যাপ্টেন মুনির, ক্যাপ্টেন জামিল (আহত), ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, লেঃ মতি ও লেঃ মোসলেহ।

দেখলাম বসার ঘরের দরজা-জানালার কাঁচের ফ্রেম কাঁচশূন্য। পিলারে গোলাগুলীর ক্ষতচিহ্ন। দরজা-জানালা ফ্রেমচ্যুত হয়ে ঝুলছে।

এখান থেকে সরে চলে এলাম গাড়ি-বারান্দার নিচে চার-পাঁচটা সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠতেই হাতের বাঁ দিকে সিঁড়ির গোড়া ঘেঁষে একটা পিলার রয়েছে। এখানে কার্পেট ও মেঝেতে শুকনো রক্তের ছাপ তখনো প্রায় স্পষ্ট। দুলাল নামক একজন পুলিশ সেদিন এখানটায় পাহারায় বসেছিলো। ১লা জুন অগুনতি জনতা জোর করে সার্কিট হাউজে ঢুকে পড়েছিলো। এরফলে সার্কিট হাউজের ৩০শে মে'র সকালবেলাকার অবস্থা আর হুবহু ছিলো না। জনতার হাঁটাহাঁটির জন্য দুলালের রক্তের ছাপ তাই অস্পষ্ট।

বারান্দা অতিক্রম করে সার্কিট হাউজের ভেতরে ঢুকতেই সামনে হলো দোতলায় ওঠার সিড়ি, বাঁ'দিকে প্রশস্ত বসার ঘর, এর পাশেই অডিটোরিয়াম, বাঁ'দিকে ডাইনিং রুম, ডাইনিং রুমের পাশেই প্রহরীদের থাকবার জন্য পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো ঘর। প্রথমেই ঢুকলাম বসার ঘরে। আগেকার দিনের খড়খড়িওলা দরজার পাল্লা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ; সারাঘর ভাঙা কাঁচে ভর্তি, সোফাসেট ও চেয়ারগুলো মনে হলো রাগের মাথায় কেউ সরিয়ে দিয়েছে। গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত দেয়ালের চুন-সুরকির চাই লাল কার্পেটকে ঢেকে রেখেছে। বড় সোফাসেটটির উপরে পিতলের বড়-বড় কয়েকটা ল্যাম্প স্তূপাকারে প'ড়ে রয়েছে। বসার ঘরের পাশেই অডিটোরিয়াম। দরজা পেরিয়ে ঢুকতেই দেখলাম বিক্ষিপ্ত তুলা স্তূপাকারে পড়ে আছে। বিরাট লম্বা টেবিলের দুটো শাদা টেবিলক্লথ গুটিয়ে পড়ে আছে টেবিলের উপরে। লাল গদিআঁটা চেয়ারগুলো স্থানচ্যুত হয়ে এলোপাথাড়ি পড়ে আছে। এই ঘরটার মেঝে নিচু দু'ধাপের সিঁড়ি টপকে নেমে এলাম ঘরের একধারে। লাল কার্পেটে লাল রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। বসার ঘর ও অডিটোরিয়ামের মাঝখানটায় সরু প্যাসেজ আছে একটা। সার্কিট হাউজের সামনের বারান্দার দিকে প্যাসেজটায় একটা দরজা আছে। সেটাও গোলাগুলীতে ভেঙে দুমড়ে গেছে। প্যাসেজটা লাল চুন-সুরকির টুকরো ও ধুলায় আচ্ছাদিত।

এবারে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছি। দোতলায় ওঠার প্রথম বাঁকেই পড়ে আছে নীল ষ্ট্যাম্পের একপাটি স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। সিঁড়ির বাঁক অতিক্রম করে উপরের দিকে ওঠার সময় পড়ে একটা জানালা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সার্কিট হাউজের পেছনের বারান্দায় লাল রক্ত শুকিয়ে আছে। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে উঠে এলাম সোজা উপরে। হাতের বাঁ'দিকে ৫ নম্বর ঘর, ডানদিকে ৪ নম্বর। এই ৪ নম্বর ঘরেই রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ঘরের সামনে খালি একটা চেয়ার রয়েছে। এই চেয়ারে বসেছিলো রাষ্ট্রপতির প্রহরী ; সে সেইরাতে নিহত হয়। ডানদিকে ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাছে রক্ত শুকিয়ে লাল কার্পেটকে আরো লাল ক'রে রেখেছে। এখানেই পড়েছিলো রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রক্তাপ্লুত দেহ। দেয়ালঘেঁষে রাষ্ট্রপতির বাঁদিকে পড়েছিলো তাঁর চশমা।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে গত ৩০শে মে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন

গত ৩০শে মে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টায় যাঁরা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা হচ্ছেন, লেঃ কর্নেল আ, ফ, ম, মইনুল আহসান (রাষ্ট্রপতির প্রধান নিরাপত্তা অফিসার), ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান (রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীর অধিনায়ক), নায়েক মোঃ আবু তাহের, সিপাহী মোঃ শাহ আলম, সিপাহী আবুল কাশেম, সিপাহী আবছর রউফ।

মনে হচ্ছে গোলাগুলীর শব্দ শুনে রাষ্ট্রপতি বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর ঘর থেকে : কি হচ্ছে জানার জন্য। পরদিন প্রত্যুষে যাঁরা রাষ্ট্রপতির লাশ দেখেছেন, তাঁদেরই একজন বললেন, সম্ভবত তিনি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে চেয়েছিলেন। তখনই মূর্তিমান আজরাইলরা রাষ্ট্রপতিকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ ক'রে দেয়। মুখ থেকে পেট পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দেহ বুলেট বৃষ্টিতে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলা হয়েছিলো।

রাষ্ট্রপতির রক্তের ছাপ দেখে ঢুকলাম ৪ নম্বর ঘরে। ঘরের কোথাও একবিন্দু রক্ত নেই। সব রক্ত শুষে নিয়েছে লাল কার্পেট। ঘরের বাইরে, ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে বিছানো কার্পেটের অংশটি।

ঘরে ঢুকতেই একদম সোজা উল্টোদিকে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বড় চওড়া আয়না। খাট, শাদা ওয়াড়ে ঢাকা একটা বালিশ। খাটের ওপর সুন্দর কারুকাজ করা একটা চাদর। রাষ্ট্রপতি জিয়া এই চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। চাদর সরিয়ে উঠেছিলেন—স্পষ্টত বোঝা যায়। দেয়াল ঘেঁষে একদিকে একটা ছোট্ট সাইড টেবিলে দুটো কাঁচের জগ ও পিরিচে রাখা কাঁচের গ্লাস রয়েছে। গ্লাসে সামান্য পানি রয়েছে। বোঝা গেলো তিনি বেশ খানিকটা পানি খেয়েছিলেন। ঘরের

মাঝখানে সেন্টার টেবিলের উপর রয়েছে একটা খালি হাফ প্লেট ও একটা খালি ছোট্টপিরিচ; পিতলের ফুলদানিতে পাতাবাহারের তোড়া। ঘরটা সুশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে।

২ নম্বর ঘরে ঢুকতেই হাতের বাঁ'দিকে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে জমাট রক্তের কালচে ছাপ এবং লণ্ডভণ্ড বিছানা, কাঠের হ্যাণ্ডেল হেলে থাকা, ভাঙা কাঁচ ও চুন সুরকি দেখে সে রাতের তাণ্ডবলীলার কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই ঘরে ছিলেন একজন রেডিও অপারেটর।

৫ নম্বর ঘরে পাশাপাশি দুটো বিছানা পাতা, মশারি টানানো। এইঘরে ছিলেন বি,এন,পি'র সেক্রেটারী জেনারেল বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মহিবুল হাসান। বৃষ্টির মতো বর্ষিত বুলেট ৫ নম্বর ঘরেও এসে পড়েছিলো। ভাঙা কাঁচ, ক্ষতবিক্ষত দেয়াল তার সাক্ষী।

৫ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম সামনের বারান্দায়। ৫ নম্বরের পাশেই রয়েছে ৬ নম্বর ঘর। ঘরটার আশেপাশে বাইরের দেয়াল বুলেটের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল ক্ষত চিহ্ন কালরাত্রিতে সংঘটিত দক্ষযজ্ঞের কথা বলছে যেন। ঝুলবারান্দায় কয়েকটি সোফাসেট রয়েছে। সেগুলোও স্থানচ্যুত। পিতলের একটা ওয়ালপ্লেট পড়ে আছে সোফার ওপর। নিচে নেমে এলাম। একদিকে বসার ঘর উল্টোদিকে ডাইনিং রুম। এখানটায় বেশ প্রশস্ত জায়গা রয়েছে। চুন-সুরকির ছাই হলদে কার্পেটকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। কাঠের সিঁড়ির তলাটা ছিলো কাঠ দিয়ে ঢাকা। সে ঢাকনির একটা অংশ উধাও। একজোড়া হলদে রঙের প্লাষ্টিকের স্যাণ্ডেল পড়ে রয়েছে।

এবারে এলাম ডাইনিং রুমে। এখানকার অবস্থাও তথৈবচ। সারাঘর লণ্ডভণ্ড পাশের দুটো অপেক্ষাকৃত ছোটঘর ছিলো প্রহরীদের। প্রথম ঘরটা একদম ফাঁকা ; দ্বিতীয় ঘরটায় বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড। হলদে কার্পেট রক্তাপ্লুত। সার্কিট হাউজের একপাশে

বাদিকের গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ: ডান দিকের গাড়ির ড্রাইভার গাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত হয়

দুটো মাইক্রোবাস পার্ক করা। একটার নাম্বার চট্টগ্রাম-৭৯৩। এই গাড়ির উইণ্ড স্ক্রীন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে গোলাগুলীতে। পাশের মাইক্রোবাসটার নাম্বার ঢাকা জ-৯৭৬। গাড়িটা সামনে দিয়ে দেখতে অক্ষত। এই গাড়ির ড্রাইভার আমীর হোসেন চাকরি করতো সি এণ্ড বি-তে। সে রাতে আমীর হোসেন ঘুমিয়েছিলো গাড়ির ভেতরে। ঘাতকের গুলী তাকেও বাঁচতে দেয়নি। গাড়ির দরজা ভেদ করে গুলী ঢোকার দুটো ছিদ্র রয়েছে।

লণ্ডভণ্ড, পর্যুদস্ত সার্কিট হাউজ থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম লনে পড়ে আছে একপাটি হলদে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল।

দোতলায় যখন আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম, সে সময় নিচতলা থেকে বলা হলো—আমাদের ফোনে কে ডাকছে। নিচে নেমে এসে দেখলাম আমাদের কেউ ফোন করেনি। আমাদের সঙ্গে পুলিশের কিছু লোক এবং জনৈক সিআইডি ছিলো। সে ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলো। মনে হলো ফোনের অপর প্রান্তের লোকটি তার সঙ্গে খুব রাগারাগি করছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্র জানান, ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ এখন প্রেতপুরীতে পরিণত হতে চলেছে, সন্ধ্যার পর কেউ আর ঐদিকের কাছে যান না। সার্কিট হাউজ এখন হন্টেড হাউজে পরিণত হয়েছে।

৪৮ ঘণ্টার চট্টগ্রাম

২৯শে মে দিবাগত রাত থেকেই চট্টগ্রামে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়। ঝড়-বৃষ্টির কারণে ঐ রাতে সার্কিট হাউজের আশপাশের লোকজন ছাড়া চট্টগ্রামবাসী গোলাগুলী শুনতে পায়নি। ৩০শে মে সকাল ৯টা পর্যন্ত সার্কিট হাউজের সামনের রাস্তা দিয়ে যাত্রীবাহী ঢাকার বাস চলাচল শুরু করে। সকাল ৯টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোকজন জানতো না রাষ্ট্রপতি জিয়া সার্কিট হাউজে নিহত হয়েছেন। ঐদিন সকাল ৭ টায় চট্টগ্রাম বেতারে জাতীয় খবর প্রচারিত হয়। মাত্র ৩ মিনিট পর আকস্মিকভাবে বাংলা খবর বন্ধ হয়ে যায়। এর অল্প পরেই চট্টগ্রাম বেতার থেকে বিদ্রোহী গ্রুপের ক্যাপ্টেন অনন্ত জেনারেল মঞ্জুরের বরাত দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার কথা ঘোষণা করেন। সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ঢাকার টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। এরপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৩০শে মে সকাল থেকে ১লা জুন সকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে একমাত্র সি. আর, বি, ও কমলাপুর রেলষ্টেশনে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ ছাড়া আর সবরকম যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন ছিলো। ঐ দু'দিন চট্টগ্রামের স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো।

৩০শে মে দুপুর তিনটায় বিদ্রোহীরা চট্টগ্রামে প্রথমে কার্ফু জারি করে। ৩১শে মে ভোর ৬টা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ ছিলো। এ-দু'দিন শহরে লোক চলাচল বলতে গেলে ছিলোই না। কিছু লোকজনকে আতঙ্কিত অবস্থায় শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম বেতারের প্রহরায় নিয়োজিত ছিলো বিদ্রোহীদের মাত্র ৬ জন সৈনিক। নন্দন কানন টি এণ্ড টি অফিসে ১০ জন ও আগ্রাবাদ টি, এণ্ড, টি, অফিসের প্রহরায় ছিলো মাত্র ১৫ জন। সন্ধ্যা ৭টার পর শহরে বিপ্লবী পরিষদ ঘোষিত সান্ধ্য আইন কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও রাত ৯টা পর্যন্ত অল্প কিছু লোক রাস্তায় চলাচল করে। এই দু'দিনের ঘটনায় বিদ্রোহী সৈন্যদের তৎপরতা চট্টগ্রামের রাজপথে দেখা যায়নি। এ-দু'দিনে কোনো গোলাগুলীর শব্দও শোনা যায়নি।

৩১শে মে রোববার সকাল ১১টায় কোর্ট বিল্ডিং-এ জেলা প্রশাসনের সাথে জেনারেল মঞ্জুর একটি মিটিং করেন। মিটিং-এ জেনারেল মঞ্জুর জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন—আমি বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান হিশেবে নই, পরিষদের একজন হিশেবে কথা বলছি। মিটিং-এ তিনি বলেন, দেশ থেকে দুর্নীতিবাজদের উৎখাতের জন্য, অর্থনৈতিক অসমতা দূর করার জন্যই এ-বিপ্লব করা হয়েছে। তিনি জেলা প্রশাসনকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতেও বলেন। জানা গেছে প্রশাসনের উদ্দেশে বিপ্লবী পরিষদ কোনো সরকারী সার্কুলার জারি করেনি.। এ মিটিং চলাকালে রেডক্রস প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির লাশ ফেরত চেয়ে রেডক্রস চেয়ারম্যানের একটি চিঠি জেনারেল মঞ্জুর কাছে প্রদান করেন। মঞ্জুর রেডক্রস প্রতিনিধিকে বলেন, জিয়ার লাশ প্রদানের ক্ষমতা এখন আর আমার নেই। বিকেলে জেনারেল মঞ্জুর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সাংবাদিকদের তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

সংখ্যার বিচারে জিয়ার ভাগ্য

মানুষের জীবনে সংখ্যার প্রভাব আছে কি?

আছে কি নেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে উদাহরণ হিশেবে ফ্রান্সের সেন্ট লুই ও রাজা ষোড়শ লুই, নেপোলিয়ন, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, শিল্পী স্যার আলমা-টাডেমা প্রমুখের উল্লেখ করা যায়।

প্রতিটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন সংখ্যা বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবনেও একটি বিশেষ সংখ্যার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সংখ্যাটি হলো ৯।

'৩৬ সালে জিয়ার জন্ম। অর্থাৎ সংখ্যা ৯। মৃত্যু '৮১ সালে; অর্থাৎ ৯। ৪৫ বছর বয়সে নিহত হন; আবারো সংখ্যা ৯।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জিয়া সম্বোধনে আখ্যায়িত হতেন অধিকাংশ সময়ে। ইংরেজী বানান ZIA-'র সংখ্যা ৯। এবং চট্টগ্রামকে ইংরেজীতে লেখা হয় CHITTAGONG—যার সংখ্যা ৯।

সংখ্যা ৯ মঙ্গলগ্রহের চিহ্ন। ৯ সংখ্যাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং রহস্যময়। প্রাচীন জাতি নবম দিবসে মৃত ব্যক্তির কবর দিতো। ৯ ঘণ্টায় 'মুক্তিদাতা' ক্রুসবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। মৃতের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য রোমানরা প্রতি ৯ বছরে ভোজসভার আয়োজন করতো। য়িহুদীদের ধর্মপুস্তক অনুযায়ী ঈশ্বর ৯ বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার দশম অবতারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে।

৯ সংখ্যার অধীনে জন্মগ্রহণ করাকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলা হয়। তবে ৯ সংখ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর প্রতীক হলো "চন্দ্রকিরণ থেকে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে। নিচে একটি নেকড়ে বাঘ এবং একটি ক্ষুধার্ত কুকুর রক্তবিন্দু পান করছে। তাদের আরো নিচে একটি কাঁকড়া তাদের সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে।"

৯ সংখ্যার প্রভাবকে বশে রাখতে অহঙ্কার ও ক্রোধ বিসর্জন দিলে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

এই সংখ্যার প্রধান গুণ—শক্তি, উদ্যম ধ্বংস ও যুদ্ধ। এবং সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও আধিপত্য।

প্রাচীন জাতিরা ৯ সংখ্যাকে ভয় করতে উপদেশ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৪৫ অর্থাৎ ৯, বছরের হিশেবে ৯, এবং চট্টগ্রাম বা চিটাগংয়ের সংখ্যা ৯।

আশেপাশে প্রচণ্ড গুলীর শব্দ

নিয়তির অমোঘ বিধানের উপরে কারো হাত নেই সত্যি। কিন্তু ভারি অস্ত্র হাতে থাকলে ঘাতকরা সহজে সার্কিট হাউজে ঢুকতে পারতো না; সার্কিট হাউজে প্রহরারত পুলিশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় হতো। ঘাতকদের অত্যাধুনিক অস্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত গোলাবৃষ্টির মুখে আমাদের রাইফেল ছিলো নিতান্তই অসহায়। এ-দৃঢ়তার সুর বেজে উঠতে দেখেছি চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন পুলিশ হাবিলদার স্বপনের কণ্ঠে। বিগত শনিবারের বিভীষিকাময় রাতে হাবিলদার স্বপনের ডিউটি ছিলো সার্কিট হাউজে। ঐদিনই বুলেটবিদ্ধ হয়ে পুলিশ হাসপাতালে তিনি নীত হন। আমাদের কথা হচ্ছিলো পুলিশ হাসপাতালে তার রোগশয্যার পাশে বসে। বাঁ পা'র হাঁটুতে গুলী লেগেছে। স্বপনের বয়স পঁচিশ/ছাব্বিশ বছর। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি স্বপন পুলিশ বিভাগে চাকরি নিয়েছে পঁচাত্তর সালে। আলাপের ফাঁকে স্বপন জানান, চারটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। তার দলের ডিউটি শেষ। পরবর্তী দলের জাহাঙ্গীরদেরকে ঘুম থেকে তোলার জন্য তিনি ডাকছিলেন। দশ-পনেরো মিনিটের ব্যবধান। এমনি সময়ে সার্কিট হাউজ ভবনের আশপাশে থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়।

সোনালি ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বপনের মতো পুলিশ বিভাগে চাকরি নিয়েছিলেন কনেষ্টবল দুলাল মিয়া। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। ক্ষমতা-লিপ্সু রাজনীতির দাবানলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে তার সংসারটিও। ঐদিন সার্কিট হাউজের দোরগোড়ায় তার ডিউটি ছিলো। গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই তার প্রাণবিয়োগ ঘটে। হাসপাতালে নীত হয়ে দুলালের পথ ধরেছেন আরো একজন কনেষ্টবল। নাম হাফিজুর রহমান। তথ্য মতে, শনিবারের হত্যাযজ্ঞে আহত হয়ে যে-সব পুলিশ কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তারা হলেন, বেলায়েত, মকসুদ আহমদ, রেজাউল হক, আবদুর রহিম, এ মজিদ প্রমুখ। পুলিশ প্রহরীরা ছিলো সার্কিট হাউজের নিচে। উল্লেখ্য, মরহুম রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সাথীদের রাত্রি যাপনের স্থান ছিলো দোতলায়। পুলিশ প্রহরীদের দোতলায় ওঠা নিষেধ ছিলো।

শনিবারের হত্যাযজ্ঞে পুলিশ নিহত হয়েছেন দু'জন। আহত হয়েছেন কয়েকজন। এটা ওপেন কথা। আসলে এ-সংখ্যাটা একেবারে নগণ্য নয়। তথ্য পরিবেষণ ক'রে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলেছেন, হতাহতের সংখ্যা ত্রিশের কোটায়।

এহেন সর্বনাশা পথ কেন বেছে নিলেন?

মঞ্জুরের এ-মতিভ্রম ঘটলো কেন? একাত্তরের যুদ্ধের সময় যে লোকটি সপরিবারে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশ নিলেন

৩০শে মে রাতে শুভপুর ব্রীজের এপার-ওপার

শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায় ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল থেকে চট্টগ্রামের শেষ কোচ ছাড়ে প্রতিদিনের মতোই। অনেক যাত্রীর মনে আতঙ্ক থাকলেও অত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে তারা চট্টগ্রাম যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। দাউদকান্দি থেকেই বাসের যাত্রীরা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা জানার ইচ্ছে পোষণ করছিলো। সমস্ত ইচ্ছে তাদের ব্যর্থ হয়। দু'থেকে তিনজন প্রহরী ছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় কোনো সেনাবাহিনীর সদস্য দেখা যায়নি। এরই মধ্যে কয়েকজন যাত্রী মন্তব্য করতে শুরু করেছেন, 'যুদ্ধ চলছে চট্টগ্রামে-ময়নামতিতে আমি থাকবে কোথা থেকে।' কুমিল্লা শহরে পৌঁছেই অনেক যাত্রী নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এরই মধ্যে ড্রাইভারের কাছে খবর এসেছে—'রাত এখানেই কাটিয়ে যান—'প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে শুভপুর ব্রীজে।' ভয়ে অনেক যাত্রী কুমিল্লা থেকে যান। ড্রাইভার জানালেন, 'তাকে চট্টগ্রাম যেতেই হবে যদি কেউ সাহস ক'রে যেতে রাজি হন তবে যেতে পারেন? চট্টগ্রামে অবস্থানরত আপনাদের চিন্তা ড্রাইভার এবং কয়েকজন যাত্রীকেও বিচলিত ক'রে তুলে এ-অবস্থা থেকেই ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন যাত্রীসহ বাসটি ফেনীতে পৌঁছে রাত পৌনে দশটায়। চট্টগ্রাম-ঢাকা সড়কে তখন সেনাবাহিনীর যানবাহন চলাচল করছে। ঐ রাতে ফেনী বাসষ্টেপেজে তখন কয়েক হাজার যাত্রী এবং যানবাহন পরিলক্ষিত হয়। রাস্তায় আটকে যাওয়া যাত্রীর ভিড়ে ফেনী তখন ভরপুর। সে রাতে ফেনীতে হোটেলের দাম বেড়েছে, ভাতের দাম বেড়েছে। অন্যান্য জিনিশপত্রের দাম বেড়েছে। একজন যাত্রীর পকেটে তখন বারো টাকা। বাস ড্রাইভার জানালেন তিনি এই রাতেই চট্টগ্রাম যাবেন। কেউ যেতে চাইলে তার সাথে যেতে পারেন। প্রিয়জনের চিন্তা কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ড্রাইভারের সাথে কিছুসংখ্যক যাত্রীও সাড়া দেয়। (বলাবাহুল্য এদের অধিকাংশই ছিলো তরুণ) রাত সোয়া দশটায় শুভপুর ব্রীজের এপারে সরকারের অনুগতবাহিনী বাস থামায়। তারা বাসের যাত্রী এবং বাসটিতে তল্লাশী চালায়।

শুভপুর ব্রীজের ঐ পারে তখন অপেক্ষা করছে মঞ্জুরের অনুগত-বাহিনী। বাসটি তাদের কাছে এলে তারাও বাসটিতে তল্লাশী চালায়। দু'দলেরকারো কাছ থেকেই যাত্রীরা কোনো খারাপ ব্যবহার পাননি। বাসটি শহরের দিকে যাচ্ছে—আতঙ্ক বাড়ছে আরো। ড্রাইভার বললেন, 'আল্লাহ বাঁচালো'। ভাটিয়ারী সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোনো প্রহরী দেখা যায়নি। রাত পৌনে বারোটায় বাসটি চট্টগ্রাম পৌঁছে। সেদিন রাতে সার্কিট হাউজে কিংবা কোনো রাস্তায় বিদ্রোহী বাহিনীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সারা চট্টগ্রাম শহরে তখন সান্ধ্যআইন। কিন্তু ইতস্তত রিকশা এবং বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত রেডিও থেকে দেশাত্মবোধক গান ভেসে আসছে। নন্দন কানন কে, সি, দে রোডের সংলগ্নে অবস্থিত টেলিফোন ভবনে দেখা গেলো বিদ্রোহী সেনা —— কোর্ট হিল এবং অন্যান্য পাহাড়েও বিদ্রোহী সেনাদলের দেখা পাওয়া যায়।

মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মেজর জেরারেল এম, এ, মঞ্জুর বীর উত্তম, পি, এস, সি, নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তান সামরিক একাডেমী থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে একটি ব্রিগেডের 'ব্রিগেড মেজর' হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সে সময় তিনজন বাঙালী অফিসারকে সাথে নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময়ও তৎকালীন মেজর এম, এ মঞ্জুরের সাথে তার দু'সন্তান ও স্ত্রী ছিলো এবং কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময়ও চার সন্তান এবং স্ত্রীকে সাথে নেন। একাত্তরের জুলাই মাসে তিনি ৮নং সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি যশোরস্থ ৫৫নং ব্রিগেডের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। প্রায় বছর দু'য়েক পর তাকে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে মিলিটারী এডভাইজার করে পাঠানো হয়। পঁচাত্তরের নভেম্বরে তাকে চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। সাতাত্তরের শেষদিকে তিনি চট্টগ্রামে ২৪-তম ডিভিশনের জি, ও, সি'র দায়িত্ব গ্রহণ দরেন এবং ২৯ শে মে পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

মঞ্জুর

মেজর জেনারেল এম, এ, মঞ্জুর কানাডা থেকে ষ্টাফ কোর্স করেন এবং লাভ করেন পি,এস,সি ডিগ্রি। সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায়ই তিনি সি,এস,এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সি,এস,পি হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে সেনাবাহিনী ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

সেই লোকটি একাশিতে হেন সর্বনাশা পথ কেন বেছে নিলেন? এর পেছনে কি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে? মঞ্জুরের কোনো রাজনৈতিক দর্শন ছিলো কি? এ-সব প্রশ্ন সংগত কারণেই সচেতনমহলের মনে প্রবলভাবে উঁকিঝুঁকি মারছে। প্রসঙ্গগত ওয়াকেবহালমহল বলেছেন, মঞ্জুর বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বিভিন্ন সময় বললেও আসলে রাজনৈতিক দর্শনে মঞ্জুর অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন।

নির্ভরশীল মহল বলেছেন, মরহুম রাষ্ট্রপতির সাথে মঞ্জুরের মতদ্বৈততা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিলো। মরহুম জিয়া এ ঠাণ্ডা লড়াইকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন নি। রাষ্ট্রপতি হত্যার খবর প্রকাশ হওয়ার পর ওয়াকেবহালমহলের কেউ-কেউ এ জন্য আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন...'মঞ্জুরকে কেন আর্মি থেকে আগে সরানো হলো না? তাহলে স্যারের উদার মনের এ সুযোগ নিতে পারতো না।'

মঞ্জুর মাওবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন? বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস এ থিউরী কি মূলত তার মাথাটি খেয়েছে? বিদেশী প্রচার মাধ্যমের প্রচারিত এ ভাষ্যকে কেউ-কেউ সমর্থন করলেও ওয়াকেবহালমহল বলছেন অন্য কথা। এ মহলের মতে, মঞ্জুর কনফিউসড পলিটিক্স এর শিকার ছিলেন। ১৯৩০ সালে সংগঠিত মাষ্টার দা'র চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শহীদদের স্মৃতিফলকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় সুধীসমাবেশে জেনারেল মঞ্জুর উপস্থিত ছিলেন। মঞ্জুর 'ট্রেণ্ড সেটার্স' নামক একটি সংস্থার চীফ প্যাট্রন ছিলেন। এ সংস্থাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত। সংস্থার সদস্যরা সবাই অভিজাত ও স্বচ্ছল পরিবারভুক্ত। গেলোবার আমেরিকান সেন্টারে এ সংস্থার একটা সেমিনারও হয়েছিলো। সংস্থার সদস্যরা কখনো সর্বহারার মানসিকতা পালন করতো না। এসব বিপরীত মুখী কর্মকাণ্ডের ওপর ওয়াকেবহালমহলের অভিমত: মঞ্জুরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঘোলাটে ছিলো। কোনো মতবাদ বা বিশেষ দলের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা জোর দিয়ে বলার অবকাশ নেই।

৪৮ ঘণ্টা চট্টগ্রাম জেনারেল মঞ্জুরের হাতে ছিলো। তথাকথিত বিপ্লবী পরিষদের ঘোষণা, তার ভাষণ সম্পর্কেও কারো-কারো মনে প্রশ্ন জেগেছে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে তাঁর দু'বার বৈঠক হয়েছে ৩১শে মে। প্রথমবার ডিসি অফিসে এবং শেষবার রেডক্রস অফিসে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের জনৈক দায়িত্বশীল মুখপাত্র বলেন, কথাবার্তায় তার রাজনৈতিক দর্শনটি আমাদের কাছে জগাখিচুড়ি মনে হয়েছে। জনৈক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, পত্রিকায় তো সেন্সরশীপ দিয়েছেন। পত্রিকার তথ্য পরিবেষণে কোনো নীতিমালা আছে কি? উত্তরে মঞ্জুর বলেছেন, 'আপনাদের বিবেক সেন্সরবোর্ডের ভূমিকা পালন করবে।'

এ-ধরনের উক্তিতে তার স্ব-বিরোধী রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র।

রাষ্ট্রপতির চট্টগ্রাম সফরের উদ্দেশ্য কি ?

রাষ্ট্রপতি জিয়ার চট্টগ্রাম সফরের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে নানা কথা বলাবলি হচ্ছে। কারো-কারো মতে, রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে মঞ্জুরের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ চলছিলো। এ-ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, এ-ব্যাপারে চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার সাথে তিনি এক বৈঠকেও বসেছিলেন। একটি বিশেষমহল বলেছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া মঞ্জুরকে বদলীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফলে মতবিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। ৪ঠা জুনের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে দেখা গেছে, রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর-পরই বিদ্রোহীদের একটি দল সার্কিট হাউজে আসে এবং রাষ্ট্রপতির কক্ষে একটি 'সিক্রেট প্ল্যান' খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়।

এদিকে অপর একটি মহল বলেছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া ২৯শে মে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন মূলত বি,এন,পি'র চট্টগ্রাম শহর শাখার বিরোধ মেটাতে। বি, এন, পি'র ঘনিষ্ঠমহল থেকে তথ্যটি মিলেছে। বিরোধ শুরু হয় '৭৯ সালে চট্টগ্রাম শহর কমিটি গঠন করা হলে, সাধারণ কর্মীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন, ইতিপূর্বে চট্রগ্রামে উক্ত দু'দল কর্মীদের মধ্যে বেশ ক'বার বড় রকমের মারপিটও হয়েছিলো। সম্প্রতি বি, এন,পি থেকে দুর্নীতিবাজদের বহিষ্কার শুরু হলে বিরোধ আরও চরমে ওঠে। কারো-কারো অভিমত : রাষ্ট্রপতি জিয়ার চট্টগ্রামে এক সমাবেশে দেয়া ভাষণের মধ্যেও চট্টগ্রামস্থ বি,এন,পি কোন্দলের গন্ধ পাওয়া যায়। বিক্ষুব্ধ চিত্তেই রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেছেন, "জাতীয়তাবাদী দল থেকে অসৎ ব্যক্তিদের শিগগিরই বের ক'রে দেয়া হবে।"

২৯শে মে সার্কিট হাউজে দলীয় কর্মীদের সাথে জিয়া এক বৈঠক ক'রে ৫ জন সদস্যকে বহিষ্কার করেন। নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন

ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে

স্ত্রীক নেপাল সফর কালে নেপালের রাজা ও রাণীর সঙ্গে

রাবাত-ই-আলম আল ইসলামের মহাসচিব শেখ মোহাম্মদ আলী-আল হার্কানের সঙ্গে

শান্তি মিশনে জিয়া : ডানে ইরানের প্রেসিডেন্ট বনিসদরের এবং বামে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে

রাত এগারোটার দিকে সার্কিট হাউজসংলগ্ন আল করিম হাউজে বসেছিলো এক গোপন বৈঠক। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, ২৯ তারিখে মরহুম রাষ্ট্রপতির কাছে একটি ডাইরী দেখা গেছে। ডাইরীতে দলের কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী সদস্যর দুষ্কর্মের পূর্ণ বিবরণ ছিলো। ২৯শে মে'র রাত আটটার দিকে এটি তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। এই বিবরণের ভিত্তিতে তিনি বর্ণিত দোষী লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রহস্যজনক ব্যাপার হলো, তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বর্ণিত ডাইরীটি পাওয়া যায়নি।

জেঃ এরশাদের সফরসঙ্গী হবার কথা ছিল ?

'আয়ুর জোর আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদের। এ-উক্তি করে নির্ভরযোগ্যসূত্র বলেছেন, সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফরসঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়ার বারণের মুখে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে ফিরিয়ে নেন। ঢাকায় থাকতে তাঁর প্রতি রাষ্ট্রপতি জিয়ারই নির্দেশ ছিলো। মরহুম রাষ্ট্রপতি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি পলেটিক্যাল কাজে চিটাগাং যাচ্ছি। আপনার যাওয়ার দরকার নেই।' নির্ভরযোগ্যসূত্র আরো উল্লেখ করেন, 'স্যারকে কেন যেতে দিলাম' অশ্রু সজল কণ্ঠে জেনারেল এরশাদ এ-ধরনের আক্ষেপউক্তি হত্যাযজ্ঞের পর করেছিলেন।

কিলিং স্কোয়াডের সদস্যসংখ্যা ছিলো কুড়ি

বিগত ত্রিশে মে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার জন্য যে গ্রুপটি গঠিত হয় তার সদস্যসংখ্যা ছিলো কুড়ি। সদস্যরা সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন। বিশ্বস্তসূত্র থেকে এ-খবরটি পাওয়া গেছে। সূত্রটি উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রপতি হত্যাযজ্ঞের নীল নক্সা প্রণয়নের চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কালুরঘাটের কোনো এক গোপন স্থানে। সময় ছিলো উনিশে মে'র মাঝরাত। সূত্রটি বলেন, 'হামলাটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিলো। হত্যাকাণ্ড সমাধা করে সার্কেট হাউজের চত্বর ত্যাগ করতে গ্রুপটির দশ মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। উল্লেখ্য, হত্যাযজ্ঞে রাষ্ট্রপতির সাথে আরো দশ জনকে বলি হতে হয়েছে।

একটি সূত্র জানান, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ত্রিশে মের ভোর আনুমানিক পৌনে চারটার দিকে কিলিং স্কোয়াড

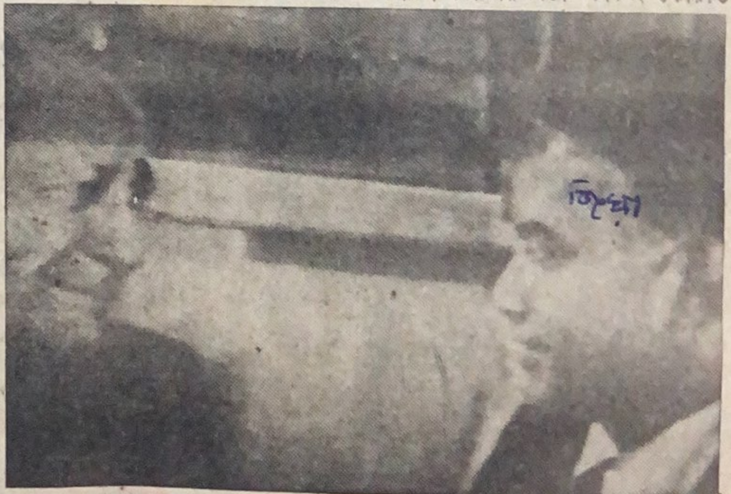

চ্যান্সেলর হেলমুট স্মীটের সঙ্গে বনে

ঢাকা বিমানবন্দরে বেলজিয়ামের রাজা ও রাণীর সম্বর্ধনায়

সার্কিট হাউজের সন্নিকটবর্তী স্থান ষ্টেডিয়ামে সমবেত হয়। এবং সার্কিট হাউজ লক্ষ্য করে কয়েক রাউণ্ড মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। এর পরপরই তিনটি পিক-আপ ভ্যানসহ আততায়ী গ্রুপের দুটো জীপ সার্কিট হাউজের প্রধান ফটকের দিকে গুলীবর্ষণ করতে করতে ছুটে যায়। ওয়াকেবহালসূত্রে প্রকাশ, আততায়ী গ্রুপটি দুটো ভাগে বিভক্ত ছিলো। এক গ্রুপের কাজ ছিলো রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা। ও অপর গ্রুপের কাজ ছিলো প্রতিরোধকে শক্ত হাতে প্রতিহত করা। গ্রেফতারকৃত কর্নেল ফজলে হোসেন এবং ক্যাপ্টেন জামিলের স্বীকারোক্তিতে জানা গেছে, হত্যাযজ্ঞে সাধারণ সৈনিকদের কোনো ভূমিকা ছিলো না।

মঞ্জুরের গ্রেফতার ও মৃত্যুবরণ

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মঞ্জুর সপরিবারে ধৃত হয়েছিলেন ফটিকছড়ি থানার পাইনদং গ্রামের খৈয়াছড়া চা বাগানের এক উপজাতীয় কুলীর ঘরে। মঞ্জুরের সাথে ছিলেন তার স্ত্রীসহ চার ছেলে-মেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স তেরো। কর্নেল দেলোয়ার নামের অপর এক অফিসারের স্ত্রী ও তিন ছেলে-মেয়ে মঞ্জুরের সাথে ছিলো। সোমবার বিকেল চারটায় চট্টগ্রাম থেকে ২৪ মাইল দূরে মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীরউত্তম পি, এস, সিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের সময় মঞ্জুর তার বাচ্চাদের ভাত খাওয়াচ্ছিলেন। এমনি সময় পুলিশের আগমনী সংকেত মঞ্জুর গৃহকর্তার মুখে টের পান। বাধা দেয়ার অভিপ্রায়ে মঞ্জুরও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃত্বের টানে মঞ্জুর তার অস্ত্র ফেলে দিয়ে পুলিশের কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন। অত্যন্ত সহজভাবেই জেনারেল মঞ্জুর পুলিশের কাছে ধরা দেন। এর পেছনে কনেষ্টবল সুধীরের কৃতিত্ব কম নয়। ফটিকছড়ি থানার কনেষ্টবল সুধীরই প্রথম মঞ্জুরকে ধরার জন্য এগিয়ে যান। মঞ্জুরে তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলে সুধীর তড়িৎগতিতে মঞ্জুরের এক কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

গ্রেফতারকৃত অবস্থায় মঞ্জুরকে সপরিবারে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যার দিকে। প্রসঙ্গত জানা গেছে, খৈয়াছড়া চা বাগানে মঞ্জুরের আত্মগোপনের খবর প্রথম পান হাটহাজারী থানা কর্তৃপক্ষ। গ্রেফতার অভিযানে যারা ছিলেন তারা হলেন হাটহাজারী থানার ইন্সপেক্টর কুদ্দুস, উখিয়া থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর এম, রব, রিজার্ভ পুলিশের সুবেদার সৈয়দ হোসেন, ডি, আই ও আকামত আলী, ফটিকছড়ি থানার ও,সি আমিনুল হক, হাটহাজারী থানার ও, সি নূর হোসেন, রিজার্ভ পুলিশের সুবেদার সৈয়দ হোসেন প্রমুখ পুলিশ কর্মীবৃন্দ। জানা গেছে জনৈক কনট্রাক্টরের জীপে করে হাটহাজারী থানায় মঞ্জুরকে সপরিবারে নিয়ে আসা হয়।

সোমবার রাত সাড়ে দশটার দিকে পুলিশের কাছ থেকে সেনাবাহিনী মঞ্জুরসহ এগারোজনকে গ্রহণ করেন। এরা হলেন বেগম মঞ্জুর, তার চার ছেলে-মেয়ে, মেজর রেজা, এবং লেঃ কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রীসহ তার তিন শিশু-কন্যা। এ-সময় পুলিশের ডি,আই,জি, জনাব শাজাহান উপস্থিত ছিলেন এবং হস্তান্তরের রশিদ নিয়েছিলেন।

হস্তান্তরের সময় মঞ্জুরের অনুরোধ ছিলো তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। সেনাবাহিনীর পক্ষে ক্যাপ্টেন এমদাদ মঞ্জুরসহ এগারোজনকে গ্রহণ করেন রাত আনুমানিক দশটার দিকে। জানা গেছে, দুটো জীপে অল্প কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্যাপ্টেন এমদাদ থানা থেকে সেনানিবাসে যাওয়ার পথে পুলিশের লোকজন সেনানিবাসের গেট পর্যন্ত মঞ্জুরের বহনকারী জীপ ফলো করেছিলো। উল্লেখ্য, হাটহাজারী থানা থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দূরত্ব আট মাইল।

মঞ্জুর নিহত হয়েছেন। সরকারী ভাষ্য মতে, সেনানিবাসে গমনের পথে একদল বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র লোক মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের সাথে গুলী বিনিময়ের সময় জেনারেল মঞ্জুর নিহত হন। খবর রয়েছে, জেনারেল মঞ্জুরের মৃত্যু নিয়েও সাধারণমহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ঘটনাস্থলে তার আরো দু'জন সহযোগী নিহত হন তারা হলেন, লেঃ কর্নেল মতিয়ুর রহমান ও লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, মঞ্জুরকে পরিবারবর্গের সাথে তোলা হয়নি। মঞ্জুরের বাচ্চা ও স্ত্রীকে অন্য একটি জীপে তোলা হয়। এদের সঠিক

সশস্ত্রবাহিনী প্রধানদের অভিনন্দন

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানরা জাতীয় চরম দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সশস্ত্রবাহিনীর সকল অফিসার ও সৈনিকদের প্রাণখোলা অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিগত ১লা জুন অপরাহ্নে রেডিও বাংলাদেশ মারফত তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রেডিও বাংলাদেশে প্রচারিত অভিনন্দন-বাণীতে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদ বলেন, পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানরা দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়েছেন তা আগামীদিনে যে কোনো দুর্যোগ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

নৌবাহিনী সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম, এ, খান তাঁর বাণীতে বলেন 'নৌবাহিনীর সদস্যরা দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও শৃঙ্খলাবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তা গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে।

বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন তাঁর বাণীতে বলেন, তিনি এ-বিষয়ে দৃঢ় আস্থাশীল যে ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলা ভবিষ্যতে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে। জাতীয় বিপর্যয় সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিমানবাহিনী সদস্যদের ভূমিকাকে তারিফ করেন।

জিয়ার সর্বশেষ টেলিফোন

২৯শে মে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান টেলিফোন করেন জেলা-সমন্বয়কারী কর্মকর্তা আব্দুর রশীদের বাসায়।

রাত সাড়ে এগারোটায় রাষ্ট্রপতি নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত আব্দুর রশীদের বাসায় ২১০৮৭৪ নম্বারে ফোন করেন। টেলিফোন ধরে আব্দুর রশীদের পিয়ন সুলতান আহমদ।

রাষ্ট্রপতি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'ডি ডি সি সাহেব বাসায় আছেন?' প্রথমে সুলতান আহমদ ভড়কে যায়। রাষ্ট্রপতি জিয়া 'দ্বিতীয় বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। সুলতান আহমদ উত্তর দিলো, 'জ্বী না, উনি আজ রাতের ট্রেনে ঢাকা গেছেন।'

রাষ্ট্রপতি জিয়া এবারে নরম গলায় বললেন, 'কি ভয় পেয়েছো?' সুলতান আহমদ বললো, 'জ্বী-না স্যার।' রাষ্ট্রপতি জিয়া টেলিফোন রেখে দেন। শেষ ফোনটি করেন ঢাকায় তাঁর স্ত্রী'র কাছে। স্ত্রীকে তিনি বলেন: 'আমি ভাল আছি, তোমরা?'

জেমস

বেগম খালেদা জিয়া

অবস্থান নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছে। বিবিসি'র ভাষ্য মতে জানা যায় মঞ্জুরের পরিবার নিরাপদ স্থানেই অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, বিবিসি'র সংবাদদাতার সাথে এক সাক্ষাৎকারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

সংসদে আলোচনা

গত বুধবার জাতীয় সংসদে উত্থাপিত শোক-প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই এ অভিমত, ব্যক্ত করেছেন যে, সঠিক তদন্তের স্বার্থেই জেনারেল মঞ্জুরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিলো।

সংসদের বিরোধীদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডে আমরা সত্যিই মর্মাহত। তাঁর মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত এ-কারণে যে, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একাত্তর সালের সাতাশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে এমন একটি সময়ে বক্তব্য রাখছি, যখন দেশের শান্তি-সংহতি সবকিছু দুর্যোগের মধ্যে নিপতিত। বিরোধীদলের নেতা গণতন্ত্র ও সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে বলেন, আমরা ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য করবো, কিভাবে সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন। তবে তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে যদি কোনো অগণতান্ত্রিক কাজে তাঁরা লিপ্ত হন আমরা তা সহ্য করতে পারবো না।

জনাব আসাদুজ্জামান খান রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল সমর্থন করি না। তাই বার-বার আমরা এর নিন্দা করেছি। এ-প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধু ও জেলখানায় চার-নেতাকে হত্যার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি দেশের সংকটময় মুহূর্তে জনগণের ঐক্য ও চেতনার প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা এই মুহূর্তে সংকট কাটাতে পেরেছি। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী, তারাও জনগণের অংশ, জনগণের সাথে-সাথে তাদের দৃঢ় পদক্ষেপও সংকট-মুক্তির সহায়ক হয়েছে। জনাব খান বলেন, এটা রাজনৈতিক মতভেদের সময় নয়, আমরা চাই জনগণের মঙ্গল, সংহতি ও উন্নতি। জরুরি

অবস্থার বিষয়ে তিনি বলেন, এটি সংসদে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হলে আমাদের বক্তব্য দেবো, এখন নয়।

জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, 'রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্মের প্রেরণায় দেশের মানুষকে জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন। তাঁহার এই কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।'

মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা জনাব খান এ সবুর বলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাথে আমার নিবিড় সংযোগ ছিলো। সাধারণ মানুষের জন্যে রাষ্ট্রপতি জিয়ার যে-অনুভূতি ছিলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গত ক'দিনে দেখেছি। তাঁর জানাজায় যে লোক সমাগম হয়েছে তা অভাবনীয়।

তিনি বলেন, কাউকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি আমরা সমর্থন করতে পারি না। কামনা করি চিরদিনের জন্যে এর অবসান ঘটুক। জনাব সবুর রাষ্ট্রপতি জিয়ার কোনো সম্পদ না থাকার বিষয় উল্লেখ করে তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশের জন্য সংসদ নেতাকে অনুরোধ জানান।

সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল মঞ্জুরের হত্যা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ (মিজান) সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মেজর জেনারেল মঞ্জুর ধরা পড়লো, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হলো কেন? কে তাকে গুলী করলো তা জানা দরকার। যে সাতজন নিয়ে বিপ্লবীপরিষদ গঠিত হয়েছিলো তারা কারা?

এসব কিছুর সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। শুধু চট্টগ্রামেই নয় আরো কোথাও কে আছে তার সাবিক তদন্ত হওয়া দরকার।

জনাব মিজান চৌধুরী বলেন: "বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী আমাদের ন্যাশনাল আর্মি। আমরা চাই না জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজ ছাড়া তাদের বন্দুক থেকে একটা বুলেটও বের হোক। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আর্মির খরচ চলে। আমরা বারবার রাষ্ট্রপতিকে হত্যা, জেলখানায় হত্যা কিংবা গুপ্তহত্যা করার জন্য ট্যাক্স দেই না।"

জাসদ সংসদীয় দলের নেতা জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, দেশ আজ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এর নিন্দা করার ভাষা আমাদের নেই। মরহুম জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে তাই জানাচ্ছি সমবেদনা। তিনি বলেন, রাজনীতি গণতান্ত্রিক পথে না-এগুলে তৃতীয়পক্ষ থেকে যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হয় রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকাণ্ড তারই সর্বশেষ পরিণতি। জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর যে বহুমুখী জাতীয় সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো তা উত্তরণের জন্যে জনগণ, সরকারীদল ও সেনাবাহিনী যেভাবে গণতান্ত্রিক পথকে রক্ষা ও সংবিধানের মর্যাদাকে উন্নীত রেখেছেন, এ দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালে নজীরবিহীন। তিনি বলেন, তবুও প্রথম চোট গেলেও জাতি এখনো সংকটমুক্ত নয়।

জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ছাড়া জাতীয় ঐক্য হয় না, এ-উদ্যোগ সরকারীদল গ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তারা রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাফল্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন আর সবাই তাঁর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবেন ব'লে মনে করি।

নির্দলীয় সদস্য ডক্টর এম, ও গনি বলেন, তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জাতি আজ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন। তিনি বলেন, যারা নেহায়েৎ গোষ্ঠিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা চিরকাল জাতির শত্রু ও গণতন্ত্রের হন্তা বলে চিহ্নিত হবে।

ডক্টর গনি দেশ ও জাতিকে চরম বিপর্যয় ও সঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্যে সশস্ত্রবাহিনীকে অভিনন্দন জানান। তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

জেনারেল মঞ্জুর বিমানে পালাতে চেয়েছিলেন

বি, জি-৪১১ নম্বরের একটি বিমান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০শে মে সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছে। সকালেই বিমানটি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এবং তারা বিমানটিকে আর উড়তে দেয়নি।

জানা যায়, সোমবার ভোরে মেজর জেনারেল মঞ্জুর এবং তাঁর কিছু সঙ্গী পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পতেঙ্গা বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ এলাকায় কর্তব্যরত সেনাবাহিনী মেজর জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষ ত্যাগ ক'রে অনুগত সরকারের পক্ষ নিয়েছে। মঞ্জুর এ-সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি দুটো জীপ নিয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে। সরকারের অনুগত সেনাবাহিনী পলায়নে বাধাপ্রদান করেন জেনারেল মঞ্জুরকে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয় বিমানবন্দর থেকে।

জনসভায় ভাষণদানরত জিয়া

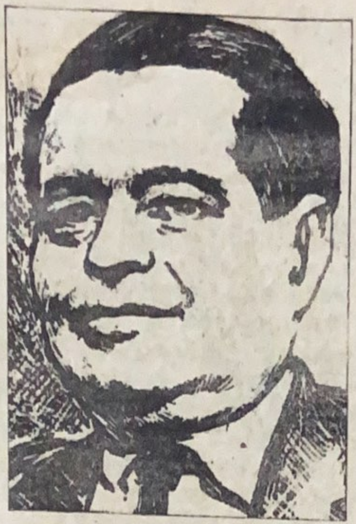

গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী

সৈয়দ তোসারফ আলী

গেলো ১লা জুন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো। একযুগ পরে নতুন প্রেক্ষাপটে আবারও তীব্রভাবে অনুভূত হলো মানিক মিয়ার অভাব। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বেঁচে থাকলে রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কি হতে পারতো এবং কি হতে পারতো না—এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মানিক মিয়াকে যাঁরা নিবিড়ভাবে জানতেন, যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন এবং আছেন তাদের কাছে মানিক মিয়া সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু যারা বয়সে নবীন, যারা জাতির মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ তারা মানিক মিয়া সম্পর্কে কতোটুকু জানে? যে আওয়ামী লীগের জন্য তিনি প্রাণপাত করে গেছেন সেই আওয়ামী লীগও আজ মানিক মিয়ার নাম উচ্চারণে এবং আদর্শ অনুসরণে পরাঙমুখ। এরচেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে। তবে আশার কথা যাদের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন সেই অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে মানিক মিয়া আজও বেঁচে আছেন। আজ এ-কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এ দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যতো পরিবর্তনই আসুক না কেন, যতো মত ও পথের প্রাদুর্ভাব ঘটুক না কেন আজকের ন্যায় আগামী দিনগুলোতেও অক্ষয় হয়ে থাকবে মানিক মিয়ার নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তার কাজ।

মানিক মিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচিত হয় রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে। তবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একবার মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী মানিক মিয়ার স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমরা দু'জনেই ছিলাম ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তবে এ-কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মানিক মিয়ার যে সাহস ছিলো. আমার তা ছিলো না। এই সাহসের জন্যই মানিক মিয়া স্মরণীয়।" মানিক মিয়ার সাহসী সত্তা সম্পর্কে মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরীর বক্তব্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। কেননা, মানিক মিয়ার সাংবাদিকতার জীবন ছিলো সাহসে নয়, দুঃসাহসিকতায় পরিপূর্ণ। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গণবিরোধী স্বরূপ উন্মোচনে, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার সত্যিই তুলনা মেলা ভার।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মানিক মিয়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কেন এতোটা সাহস দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের মানিক মিয়ার রাজনৈতিক মানস বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ মানিক মিয়া ছিলেন সবার আগে রাজনীতিক। এবং পরম আত্মবিশ্বাসী রাজনীতিক। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিলো রাজনীতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও গণ-অধিকারের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। আর এজন্যই তিনি সাংবাদিক হিশেবে দৈনিক ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক মঞ্চে' 'মুসাফির' ছদ্মনামে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আপন বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে সচেতন ক'রে তুলেছিলেন এ-দেশের রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও জনতাকে। তার ধাতটাই ছিলো সংগ্রামের। সত্যি বলতে কি, যে আবেগ, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। এ-জন্য তাঁকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। মৌলিক গণতন্ত্রী এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রীরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বার-বার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করেছে, প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছে কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, কোনো কিছুই মানিক মিয়ার কলমকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

রাজনীতি সচেতন সাংবাদিক হিশেবে মানিক মিয়া ছিলেন তার সময়কার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং সমালোচক। অন্যায়, অত্যাচার, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী। তার সময়েও দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিলো না কিন্তু মানিক মিয়া নির্ভয়ে লিখতেন। কারণ তিনি জানতেন স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না, স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। অনেকের মতে সত্য প্রকাশের এই দুরন্ত

সাহস ও নিঃস্বার্থ ভূমিকার জন্যই মানিক মিয়া তার সময়ের রাজনৈতিক গতিধারার ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানিক মিয়ার কর্মজীবন ছিলো রাজনীতি ও সাংবাদিকতার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। অন্যভাবে বলা যায়, সাংবাদিক হিশেবে মানিক মিয়া ছিলেন তার সমকালের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও জনমত সংগঠক। এখন প্রশ্ন হলো, মানিক মিয়া কোন্ রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে তার সময়কার রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কোন রাজনৈতিক প্রত্যয় দিয়ে তিনি চলমান রাজনীতিতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই মানিক মিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারা (Political thought) সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে দুটো বড় ধরনের ঘটনা হলো ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এবং ১৯৭১ সালে উপমহাদেশের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই দুটো তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে। মানিক মিয়া তাঁর চাকরি জীবন ত্যাগ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে। শহীদ সাহেবই মানিক মিয়াকে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি নিয়োগ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "এইখানেই উপমহাদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সাথে মরহুম তফাজ্জল হোসেনের পরিচয় ঘটে এবং তাঁর নিজস্ব মতাদর্শও একটা বিশেষরূপ পরিগ্রহ করে। তবে এ-ক্ষেত্রে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।"

সুতরাং সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, শহীদ সাহেব যেহেতু সে সময় মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন, সেহেতু মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়েই মানিক মিয়া সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু যে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে নিজকে সম্পৃক্ত করেছিলেন সে-বিশ্বাস তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তার সে বিশ্বাসে চিড় ধরে। মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে যে আশা সেদিন জনমনে দানাবেঁধেছিলো, যে-বিশ্বাস নিয়ে এ-দেশের মুসলিম জনতা পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল হয়েছিলো সে-আশা এবং বিশ্বাস ভঙ্গ হবার কারণেই অনেকের ন্যায় মানিক মিয়াও তার রাজনৈতিক চিন্তাকে নতুন করে পুনর্গঠিত করতে সচেষ্ট হন। এ-প্রসঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে-কথাগুলো অকপটে স্বীকার করেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। দেখুন তিনি কি বলেছিলেন: "রাজনীতির ছাত্র মাত্রই জানেন, পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দু'টি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রকৃত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল ছিলো না। ছিলো রাজনৈতিক প্লাটফর্ম, যে প্লাটফর্মে জমায়েত হয়েছিলেন নানা শ্রেণীর, নানা স্বার্থের ও নানা পেশার লোক। সকলেরই সাধারণ লক্ষ্য ছিলো স্বাধীনতা; কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। উদাহরণ হিশেবে আমি মুসলিম লীগের কথাই তুলে ধরতে পারি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এই মুসলিম লীগকে অর্থ সাহায্য যুগিয়েছেন উদীয়মান মুসলিম ধনিক ও বণিক শ্রেণী। তারা ভেবেছেন পাকিস্তান অর্জিত হলে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতিযোগিতামুক্ত হয়ে তারা হবেন সর্বেসর্বা। মুসলিম লীগকে সমর্থন যুগিয়েছেন তদানীন্তন ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম আমলাতন্ত্র। তাঁরা দেখেছেন, পাকিস্তান হলে তাদের লাভ অবশ্যম্ভাবী, আর আমরা যারা ছিলাম মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মী, সাধারণ সমর্থক, এ দেশের হাজার-হাজার কোটি-কোটি নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ; আমরা ভেবেছি পাকিস্তান মানেই আমাদের শোষণ ও পীড়নের অবসান; নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের, নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা লাভ। পাকিস্তানের জন্য তাই কোটি-কোটি সাধারণ মানুষ সেদিন চরম দুঃখ ও ত্যাগ বরণে পশ্চাদপদ হয়নি, পুলিশের গুলীতে তারা প্রাণ দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাংগায় তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, বাস্তুভিটা হারিয়ে পথের কাঙাল হয়েছে। আমাদের লাখ-লাখ ভাইয়ের রক্তদান, চরম স্বার্থ ত্যাগ, হাজার-হাজার মা-বোনের চোখের অশ্রু ও ইজ্জতের বিনিময়ে যে-পাকিস্তান আমরা অর্জন করেছি, তাতে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী' কিংবা আমলাতন্ত্রের বাদশাহী কায়েম হবে বিশ্বাস করুন এমন প্রত্যাশা আমরা করিনি।

কিন্তু আমরা ভুল করেছিলাম। প্লাটফর্মকে আমরা ভেবেছিলাম দল। যে রাজনৈতিক বহুমুখীনতার মধ্যে সমাজের শ্রেণীস্বার্থের সমন্বয়, তাকে বর্জন করে একমুখীনতাকে ভেবেছিলাম জাতীয় ঐক্য। ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাখাদ্য এমন কি ভৌগোলিক পরিবেশকে বিস্মৃত হয়ে একমাত্র ধর্মীয় আবেদনের মধ্যেই ভেবেছিলাম আমাদের জাতীয় সমস্যার সব সমাধান নিহিত।" এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়, কেন মানিক মিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের রাজনীতি বর্জন করেছিলেন। কেন তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তাকে নতুন উপলব্ধির আলোকে পুনর্গঠিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানিক মিয়ার সামগ্রিক রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় এই নবতর উপলব্ধির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনকে

গত ২৮শে মে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) রচিত 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বক্তৃতা করছেন জনাব আতাউর রহমান খান। পাশে উপবিষ্ট (বা' থেকে) সর্বজনাব আবদুল ওহাব, সৈয়দ আলী আহসান, আসাফ-উদ-দৌলা রেজা ও রোববার সম্পাদক আবদুল হাফিজ

কেন্দ্র ক'রে পূর্ব-বাংলায় নতুন ক'রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা. '৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগের ভরাডুবি, ষাটের দশকে অ-গণতান্ত্রিক সংবিধান ও মৌলিক গণতন্ত্র বিরোধী গণ-আন্দোলন, শেখ মুজিবের ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম এক কথায় প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে জনবোধ্য ভাষায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে মানিক মিয়া যে সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, পাকিস্তানী শাসকচক্র দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে মানিক মিয়ার সু-চিন্তিত মতামতের গুরুত্ব অনুধাবনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ফল যা হবার তাই হয়েছে। রাজনৈতিক ইস্যুর রাজনৈতিক মীমাংসা হবার পরিবর্তে সামরিক ফয়সালা হয়েছে। মানিক মিয়া উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর-পরই মারা না গেলে কি হতো সেটা অবশ্য গবেষণার বিষয়। সে যাই হোক, মানিক মিয়া ছিলেন গণতন্ত্র ও গণ-অধিকারের প্রতি অবিচল আস্থাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যেমন জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি কিংবা অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়ন-এর যে কোনো অজুহাতে গণতন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এই তত্ত্ব মানতে রাজি ছিলেন না, তেমনি ধনতন্ত্রের স্মৃতিকাগারে যে-গণতন্ত্রের জন্ম ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকটের দিনে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—এই নতুন তত্ত্বকথাকেও মানিক মিয়া স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এ সম্পর্কে শহীদ সাহেবের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মানিক মিয়া বলেছিলেন, "এটা সত্য, গণতন্ত্রের জন্য আজ বড় দুঃসময়। গণতন্ত্রের উপর হামলা শুধু তাত্ত্বিকদের শিবির থেকেই আসেনি, এসেছে কায়েমীস্বার্থ আর একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত ভৃত্যদের শিবির থেকেও। এই দুই শিবিরে নিজেদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যতো বাড়ছে গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত প্রথার প্রতি নয়, নীতির প্রতি আমাদের আস্থাও ততো বাড়ছে। আসলে সংকট শুধু আজ একটা শিবিরে নয় দুটো শিবিরেই। ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এ-দুটো ব্যবস্থাই আজ দ্রুত আবর্তিত, বিবর্তিত পরিবর্তিত হচ্ছে। ধনতন্ত্র আজ আর সেই আগের ধনতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্রেরও পঞ্চাশ বছর আগের সেই চেহারা আর নেই। দুটো ব্যবস্থাই দ্রুত আবর্তন বিবর্তনের মাঝ দিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এখন বড়-বড় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা ও একচেটিয়া পুঁজির থাবা থেকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়। আবার সোভিয়েত রাশিয়াতেও আজ চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, কি-ভাবে রাষ্ট্রের অচলায়তনের নিগড় থেকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অন্তত কিছুটা হলেও মুক্ত করা যায়। অর্থাৎ একটির লক্ষ্য গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কল্যাণ, আরেকটির লক্ষ্য রাজনৈতিক মুক্তি।

আর এই দু'য়ের সমন্বয়ে আজ দ্বন্দ্বমুখর বিশ্বে প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" এটা নিছক মানিক মিয়ার তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়। বরং এটাই ছিলো তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দিগদর্শন। এটাই তাঁর রাষ্ট্র চিন্তার মূল কথা। মানিক মিয়া এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পাকিস্তানী রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি উঠেছে সেই দাবি পূরণ করা হলেও জনজীবনের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। তাই তিনি স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বীয় ক্ষমতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "...রাজনীতির ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি হিশেবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান পুঁজিবাদীও মনোপলিভিত্তিক অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পাল্টাইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সমতা দাবি করে, তবে প্রচলিত ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে নয়। আমরা অবাঙালীর স্থলে বাঙালী পুঁজিপতিদের সমতাবিধান করিতে চাই না। তাতে দেশবাসীর অর্থনৈতিক, উন্নয়ন সাধিত হইবে না; বরং ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় বাঙালী পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা বাঙালীর জন্য অধিকতর ক্ষতিকারক হইয়া দাঁড়াইবে।" রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কে কতোটা স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মতামত ব্যক্ত করা যায় সেটা আজ গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

শওকত মাহমুদ

পেরু

ষাট দশকের শুরুতে পেরুর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক গেরিলা আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। গেরিলা আন্দোলন দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে '৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী অস্কার ট্রেলাস পদত্যাগ করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার ৩/২ ভাগ ইণ্ডিয়ান। অথচ সরকার তাদেরকে ক্রমাগত অবহেলা করছিলেন বলে, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অসন্তোষ জমে ওঠে; যার পরিণতি সন্ত্রাসবাদ। তাই ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত এন্ডেজ অঞ্চলে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

'৬৫ সালে আন্দোলন চরমে ওঠে। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ৪ঠা জুলাই '৬৫তে বন্ধুর পাহাড়-জঙ্গলে অভিযান শুরু করে। একই দিনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাশিয়া, কিউবা ও চীনকে সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেয়ার জন্যে দায়ী করেন। '৬৫ ও '৬৬'র প্রথম ছ'মাসের মধ্যে গেরিলারা ধরা বা মারা পড়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে '৬৫'র অক্টোবরে, কায়্‌কো অঞ্চলে, গেরিলা নেতা ও আইনজীবী Luis de la puen te uceda মারা পড়েন। '৬৬'র ১৯শে জুন সরকার ঘোষণা করে, গেরিলাদের নির্মূল করা হয়েছে।

কিন্তু আন্দোলনের শেষ এখানেই নয়। সত্তর দশকে শহরে সন্ত্রাসবাদ চাড়া দিয়ে ওঠে। এ-সময়ে কয়েকটি গ্রুপ কাজ করছিলো। এদের মতাদর্শগত পার্থক্য ছিলো, যদিও অধিকাংশ বামপন্থী।

মূলত এ-দেশের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় কম কারণ সরকার এসব ঘটনা প্রকাশ করতো না: পশ্চিমের সংবাদপত্রগুলোও ছিলো সেরকম নির্লিপ্ত। যাহোক, '৭২ সালে যদিও সরকার বামপন্থী গ্রুপদ্বয় APRA ও MIR-এর সমর্থন পাচ্ছিলেন, তবুও কয়েকটি গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছিলো। এ-সময়কার এমআই আরের নেতা হেক্টর বেজার্ সরকারকে সমর্থন করছিলেন।

'৭২-র মার্চে সরকার ঘোষণা করে, 'Vanguardia Revolucionaria' গ্রুপের দশজন সদস্য ধরা পড়েছে। এরা ১৩টি ব্যাংক ডাকাতি, ছিনতাই ও দু'জন পুলিশ হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ছিলো সরকারী মতে।

একই বছরের তারা আগষ্ট

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানায় এম আই আরের ১৫ জন ভিন্নমতাবলম্বী সদস্যকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যায়েন্ প্রদেশে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এদের নেতা ফার্নান্দো ও অন্য পাঁচজন গেরিলা পালাতে সক্ষম হয়।

এদিকে পুনো প্রশাসনিক বিভাগে উগ্রবামপন্থীরা তৎপরতা চালাচ্ছিলো। তাই জুলাই মাসে সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তথায় ছাত্র-পুলিশের সাথে কয়েক দফা সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন নিহত হয়। এরপরে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

(ক্রমশ)

পেরু প্রজাতন্ত্র

জনসংখ্যা ('৭৮): ১,৬৮,২০,০০০, আয়তন: ৪,৯৬,২২২ বর্গমাইল, ঘনত্ব: ৩৩'৪১ প্রতি বর্গমাইলে, নগরীর জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬২'৫%, ভাষা: স্পেনিশ, কুয়েনিয়া, ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক ৯০%, রাজধানী: লিমা, প্রধান শহর: আরেকুইবা, ক্যালাও, প্রশাসনিক বিভাগ: ২৩টি, প্রদেশ: ১, শিল্প: মাছ, লোহা, সূতা, কৃষিজাত দ্রব্য: চিনি, কফি, চাল, খনিজ দ্রব্য: কপার, জিংক, লোহা, তেল, মাথাপিছু জমি: ০'৪ একর, মাথাপিছু আয়: ('৭৭-এর হিশেবে) ৭৪৮ মার্কিন ডলার, মুদ্রা: সোল ('৭৯-র মার্চের হিশেবে ২১১'৩৫ সোল= ১ মার্কিন ডলার), শিক্ষিতের হার: ৭২%, পত্রিকার প্রচার: এক হাজারে ৯৫ জন, সশস্ত্র বাহিনী: ৮৯,০০০, প্যারা মিলিটারী: ২০,০০০।

বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা

তাপস মজুমদার

তৃতীয় তথা অনুন্নত বিশ্বের পল্লী উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কার বিষয়ে সর্বশেষ সেমিনারটি গত ১৯শে মে ঢাকায় শুরু হয়েছিলো। সাতদিন ব্যাপী এই দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষিসংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। এই সম্মেলনে ১৬টি দেশ ও ৪টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ৪৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূর করা, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে ধরার লক্ষ্যে আশুভূমি সংস্কার প্রয়োজন। এশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূমি সংস্কার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্ত : ভূমি সংস্কার না-হওয়ার কারণেই বিশেষ করে এশিয়া দারিদ্র্যে জর্জরিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চারদিনব্যাপী বিশেষ সম্মেলনও সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সেখানেও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভূমি-সংস্কারের মতো মৌলিক বিষয়ে হাত-না দিয়ে এবং ভূমির মালিকানা প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্তে না-এসে কেবলমাত্র সংস্কারমূলক কিছু কাজ করে মূল সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এ-তে উৎপাদন বৃদ্ধি যেমনি করা যাবে না, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে কৃষিকে রক্ষা করাও তেমনি সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশের ভূমি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য দেয়া মুশকিল। সত্যি বলতে কি, নির্ভরযোগ্য কোনো পরিসংখ্যানই নেই। প্রাপ্ত অধিকাংশ পরিসংখ্যানই নিছক অনুমান নির্ভর, ছোট-বড় ধরনের যোগফল এবং পরস্পরবিরোধী তথ্যে পরিপূর্ণ। এ-অভিযোগ দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞমহলের। উদাহরণত, ১৯৭৭-৭৮ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর নোট বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে কোনো অনাবাদী জমি নেই। আবাদী জমির পরিমাণ বলা হয়েছে ২ কোটি সাড়ে ১৫ লাখ একর। ১৯৭৫-৭৬ সালে চাষাবাদ করা হয়েছে ২ কোটি সাড়ে ৯ লাখ একরে। তাহলে বাকি জমি কি অনাবাদী থেকে যাচ্ছে না? পাশাপাশি ১৯৭৭ সালের কৃষি শুমারি রিপোর্টে আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি সাড়ে ১৯ লাখ বলা হয়েছে। এরমধ্যে পতিত জমির পরিমাণ সাড়ে ২৪ লাখ একর। আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির হার ১.৮ ভাগ। এরমধ্যে আমরা কোনটিকে সঠিক তথ্য হিশেবে ধরে নেবো?

তবু পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে আমরা বর্তমান ভূমি সংক্রান্ত মোটামুটি প্রাপ্ত তথ্য পেশ করলাম।

ভূমি প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য

ভূমি রাজস্ব আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি হলো—ভূমি রাজস্ব (L.D Tax) তহশীল অফিসের মাধ্যমে আদায় করা হয়। সারা দেশে ২০০২টি তহশীল অফিস বর্তমান। তহশীলগুলো ৩২৭টি রাজস্ব সার্কেলে বিভক্ত। প্রতিটি সার্কেলে ১ জন করে রাজস্ব কর্মকর্তা (সি, ও, রেভিনিউ) ও অফিস আছে। তহশীল অফিসের অনিয়মতান্ত্রিক কাজের জন্যে মহকুমা প্রশাসক ও জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজস্বের নিকট জবাবদিহি করে থাকে।

ভূমির উপর কর ধার্য ব্যবস্থা—কৃষি জমি প্রতি ডিসিমাল তিন পয়সা, ন্যূনতম ৯০ পয়সা, পরিবার কিছু ৪'২৫ একর পর্যন্ত। ৪'২৫ একরের উর্ধ্বে ১৫ পয়সা প্রতি ডিসিমাল। অকৃষি জমি—(ক) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় পুলিশ ষ্টেশনের নিকটবর্তী—ব্যবসা ও শিল্প কারখানার জন্যে পনেরো টাকা প্রতি ডিসিমাল। আবাসিক ব্যবহারের জন্যে প্রতি ডিসিমাল তিন টাকা। (খ) অন্যান্য এলাকায় প্রতি ডিসিমাল তিন টাকা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে। আবাসিক ব্যবহারের জন্যে ১'৫০ টাকা।

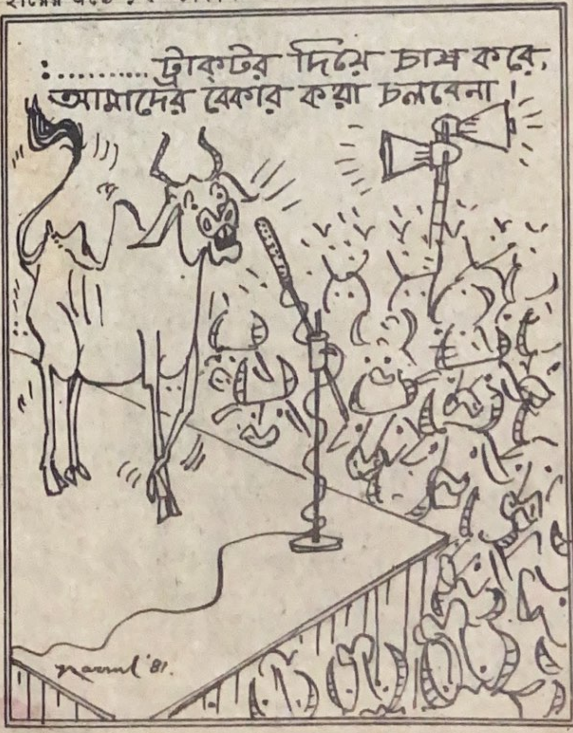
..........ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে, আমাদের বেকার করা চলবেনা!
nazrul '81

এই হিশেবে ভূমি খাতে আয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে ভূমির খাতে মোট দাবি :

(ক) ভূমি উন্নয়ন কর ··· ··· ··· ১৯,৫৮,৬৪,২৯২/-
(খ) বকেয়া রাজস্ব ইত্যাদি ··· ··· ১,৫১,৩২,৮৬৬/-
মোট : ২১,০৯,৯৭,১৭৮/:

তন্মধ্যে মোট আদায়
(ক) ভূমিউন্নয়ন কর···১৫,৭৭,৩২,৯২৮ /-
(খ) বকেয়া রাজস্ব ইত্যাদি···১,১৪,৭৩,৬২২/-
মোট···১৬,৯১,৭৬,৫৫০/-

১৯৭৮-৭৯ অর্থ বছরে ভূমি খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ : —১৬,৪৯,৮৮,৮৭১/-

দেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ—১১৭৬'০৩ একর
কৃষি—৭১৬'৪৯।। একর
অকৃষি (খালি)—৪৫৯'৫৩।। একর

পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের বর্তমান পদ্ধতি বাংলাদেশ গেজেটের সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৭২ ; শুক্রবার মার্চ ১০, ১৯৭২ এবং শুক্রবার মে ১২, ১৯৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি (Vested Properties)

বর্তমান পরিমাণ, ১৯৬৯ সালের সেন্সাস অনুযায়ী—
কৃষি জমি ···········৭,১৯,০২৪'৮৪ একর
এক্সচেঞ্জ কেসের অন্তর্ভুক্ত·········৩,০৩,৪৮২'২৪ „
রেগুলারাইজড হয়েছে···········১,৩১,৩২৫'৯৬ „
বাকি···১,৭২,১৫৬'২৮ একর

রেগুলারাইজড হওয়ার অপেক্ষায়।

বাদবাকি ৪,১৫,৫৪২'৬০ একরের মধ্যে মাত্র ১,৩২,২৫৫'৮৮ একর বাৎসরিক ভিত্তিতে লিজ দেয়া হয়। The remaining properties are either enjoined by unauthorised person's or are claimed by persons by dint of fictitious transfer dedds.

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি, পাকা বাড়ি—৫,১৬২টি
লিজ দেয়া হয়েছে —৪,২৫০টি
কাঁচা বাড়ি —তথ্য নেই
লিজ দেয়া হয়েছে —৫৮১৭টি

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি বিষয়ক হাজার-হাজার কেস মালিকানা নির্ধারণের অপেক্ষায় বছরের-পর-বছর সিভিল কোর্টে পড়ে আছে। শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের বর্তমান পদ্ধতি সরকারের সারকুলার নং I A—1/77/156-R.2. তারিখ ঢাকা মে ২৩, ১৯৭৭ বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি সংক্রান্ত তথ্য

১। মোট আবাদযোগ্য ভূমি :—২,৩১,৮৬,৪৩২ একর।

২। মোট সরকারী খাস জমি :—২,৫৪,১২৯ একর (কৃষি)।

৩। সর্বমোট ভূমি :—৩,৪৬,৫১,১৪৮'৮০ একর (মোট আয়তন)।

৪। বসতবাটীতে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ :—১১,৭৬,৮৩২ একর (পল্লী এলাকায়)।

৫। একশ বিঘার উর্ধ্বে ভূমির মালিকের সংখ্যা :—৭,০৫৬।

৬। ২৫ বিঘার উর্ধ্বে মালিকের সংখ্যা :—৪,৩৭,৬৪০।
(ক) ২৫ বিঘার নিম্নে জমির মালিকের বর্তমান সংখ্যা :—(এ তথ্য নেই)।

৭। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা :—৩৮,৮৫,৭৩৩ (৩২'৮০%)
৮। ভূমিহীন লোকের সংখ্যা :—১,৮৭,০৩,৪৭২ (২৭'১০%)

৯। ওয়াকফ জমির পরিমাণ :—ওয়াকফ এষ্টেটের সংখ্যা ১০,৮১৩

১০। ওয়াকফ জমির পরিচালন ব্যবস্থা (বর্তমান) :—১৯৬২ ইং সালের ১ নং অধ্যাদেশ এবং উহার আওতাধীন ১৯৭৫ সালের বিধি মোতাবেক প্রশাসিত হয়ে থাকে।

১১। বনবিভাগের জন্য রক্ষিত ভূমির পরিমাণ :—৫৪,২৫,৪৬২ একর (মোট বনাঞ্চল)।

১২। বনবিভাগের আওতায় আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ :—(তথ্য নেই)।

১৩। বনবিভাগের আওতায় পতিত ভূমির পরিমাণ :—(তথ্য নেই)।

১৪। শহর এলাকায় মোট ভূমির পরিমাণ :—২,৭০,৯৫৬ একর।

১৫। জলাভূমির মোট পরিমাণ :—১০,৪২১টি

১৬। মৎস্য বিভাগের আওতায় ভূমির পরিমাণ :—৩২৯টি জলাভূমি।

১৭। চর এলাকায় মোট খাসজমির বর্তমান পরিমাণ :—৩,৮০,৮৮৯ একর।

১৮। রেলের আওতায় বা দখলে বর্তমান ভূমির পরিমাণ :—৭০,০০০ একর (প্রায়)।

১৯। রেলওয়ের দখলে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ :—(তথ্য নেই)।

২০। পতিত খাল-বিল (খাস+বন্দোবস্ত) পরিমাণ :—(তথ্য নেই)।

২১। উপকূলীয় বনবিভাগের আওতায় ছেড়ে দেয়ার জমির বর্তমান পরিমাণ :—১২,৩০,০০০ একর

২২। টোটাল ইরিগেটেড ল্যাণ্ড :—৩০,০৯,০৭০ একর

২৩। মোট জমি (ক) পাট :—১৬,০৩,৪৩০ একর

২৪। (খ) আখ :—৩,৫৭,২৮৫ একর
(গ) তুলা :—১৩,১২১ একর
(ঘ) লবণ :—(তথ্য নেই)
(ঙ) অন্যান্য :—(তথ্য নেই)

২৫। জমির কোন শ্রেণী থাকিলে :
(১) তথ্য নেই
(২) তথ্য নেই
(৩) তথ্য নেই

২৬। মোট জমি (ক) এক ফসলী :—১, ১৬, ২৩, ২৬৪ একর
(খ) দু-ফসলী—: ৭৫, ১৯, ৯৮৪ একর
(গ) তিন ফসলী : ১৪, ৮৯, ৬৩১ একর

২৭। সরকারী খাস (মজা) পুকুরের সংখ্যা :—৭,৬৬৬টি

২৮। জমির পরিমাণ :—১১,২৬৯ একর

সরকারী খাস পুকুরের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা—২ একরের নিচে সমস্ত পুকুর সরকারের বর্তমান নীতি মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মৎস্য বিভাগের আওতায়ও কিছু পুকুর রয়েছে। ২ একরের উর্ধ্বে সমস্ত পুকুর ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয় মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন।

ভূমি সংস্কার কমিটি

সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মাহমুদুল করিম, এমপি ; জনাব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, এমপি ; জনাব এম,এ, হাই, এমপি ; জনাব কাজি এ,টি, মনোয়ারউদ্দিন, এমপি ; জনাব মো: কোফিলউদ্দিন, এমপি ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মিসেস তসলিমা আবেদ, এমপি এই কমিটির সদস্যবৃন্দ। ভূমি সংস্কার কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাহমুদুল করিম।

অত:পর ভূমি সংস্কার কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় সুপারিশাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা গেলো।

ভূমি সংস্কার কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট

ভূমি বাংলাদেশের সামাজিক ভিত্তি। আমাদের সমাজব্যবস্থা ভূমিব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে। এ-ব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা এখনও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট। বলতে গেলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের ভূমিব্যবস্থা যেরূপ ছিলো, বাংলাদেশের বর্তমান ভূমিব্যবস্থা মূলত সে পর্যায়েই রয়ে গেছে। সনাতন সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা বাতিল করে আধুনিক ভূমি সংস্কার প্রবর্তনে বিরাট বাধা হিশেবে 'ধর্ম'ও অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত হয় আধুনিক সংস্কার এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন একটা দুরূহ কাজ। বর্তমান ভূমিব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকসমাজকে পুনর্বাসন করা একেবারেই অসম্ভব। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমাদের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ভূমিহীন। ভূমি ও বাস্তুভিটাহীন পরিবারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। শহর এলাকায় ভাসমান জনতার ভিড় গত কয়েক বছরে আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সাগর ও নদীর ভাঙনে অবস্থা দিন-দিন জটিল আকার ধারণ করেছে। কৃষকের দুরবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় আমাদের সমুদয় চিন্তাধারা এবং জীবনব্যবস্থা। উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ভূমিব্যবস্থার ওপরই নির্ভরশীল। এই ভূমিব্যবস্থা আবার নির্ভর করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতির ওপর। মধ্যযুগীয় ধর্মাধিপত্য আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভূমিসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-কানুনও রচিত হয়েছে ভূমিকে কেন্দ্র করেই। ঔপনিবেশিক আমলের রচিত আইন-কানুন এখনও আমাদের ভূমিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ; ফলে দেখা যায় যে, ভূমি রাজস্বের নিরাপত্তা-বিধান ছাড়া ভূমি সংস্কারের কোনো ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়নি।

ভূমিই আমাদের সমস্ত সম্পদের উৎস। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বন্টনব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব নয়। ভূমিব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করে উৎপাদনব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ভূমি-বিন্যাস এবং সংস্কারের মধ্যে নিহিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে ব্যর্থ হলে কোনো ব্যবস্থাই আমাদের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের সীমিত ভূমি সম্পদের ওপর এক বিশাল জনগোষ্ঠির দারুণ চাপের সৃষ্টি হয়েছে। ভূমির উপরে এই চাপ এখন এক আশঙ্কাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে এই চাপ প্রতিহত করতে না পারলে ভূমিসংস্কার এবং আধুনিকীকরণের যে-কোনো রকম পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঔপনিবেশিক স্বার্থে কেবলমাত্র রাজস্ব আয় বাড়ানোর কারণেই যে ভূমিপ্রশাসনব্যবস্থা এখনও বহাল তবিয়তে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন ব্যবস্থা কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থেই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, তা নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং চিন্তাধারার সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন করা অপরিহার্য। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ভূমি রাজস্ব খাতে বর্তমানে যে আয় হয় একই খাতে তার কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধাতে তা ব্যয় হয়ে যায়। ফলে ভূমিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অথবা কোনো রকমের সংস্কার বর্তমান ভূমি প্রশাসন সংস্থা করতে অক্ষম।

স্বল্পসময়ের মধ্যে ভূমি সংস্কার কমিটি সম্ভবপর সকল দিক বিবেচনার প্রয়াস চালিয়েছে। বাংলাদেশের সবচাইতে জটিল এবং কঠিন এই সমস্যা সমাধানের বিস্তারিত সুপারিশ স্বল্পসময়ের মধ্যে করা কমিটির পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে কমিটি সবিনয় বিবেচনা, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য আশুব্যবস্থা হিশেবে নিম্নলিখিত সুপারিশাবলি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির বরাবরে পেশ করছে। ভূমি সংস্কার কমিটি মনে করেন যে, কমিটির সে সুপারিশাবলি কার্যকরকরণের মাধ্যমে পেশকৃত একটা যুগোপযোগী আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা যায়। বিস্তারিত সুপারিশাবলি পেশ করবার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় নির্বাহী কমিটির কাছে সময়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমেই নিম্নলিখিত সুপারিশাবলি জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে বিবেচনা করবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

সুপারিশাবলি

১। ব্যক্তিমালিকানায় জমির সর্বোচ্চসীমা পুনঃনির্ধারণ এবং পঞ্চাশ বিঘার মধ্যে ধার্যকরণ।

২। উদ্বৃত্ত জমি, খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তিভুক্ত কৃষি-যোগ্য জমি, পরিত্যক্ত সম্পত্তিভুক্ত কৃষি জমি এবং চর এলাকার আবাদযোগ্য খাস জমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকপরিবারের মধ্যে বিলিবন্টন করা। শহর এলাকায় আগত ভাসমান ভিটেমাটিহীন পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩, পঞ্চাশ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা করা।

৪, বর্গাদারদের মাধ্যমে চাষকরা জমির উৎপাদিত ফসলের নিম্নরূপ ভাগ-বন্টনের ব্যবস্থা এবং উৎপাদন খরচা ভাগাভাগির ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা গেলো।

(ক) হাল+গোরু+শ্রম=৩/১।

(খ) বীজ+সার+কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি=৩/১

(গ) জমির মালিক=৩/১।

'খ'-এর খরচ কৃষক এবং মালিক উভয় পক্ষকে সমহারে বহন করতে হবে। 'খ'-এর ভাগের ফসল খরচের অনুপাতে পক্ষদ্বয় ভাগ করে নেবে।

৫, বনবিভাগের আওতায় আবাদযোগ্য পতিত ভূমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক-পরিবারের মধ্যে চাষাবাদের জন্য বন্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে। বনজ কৃষি উৎপাদনেই এই সমস্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬, মৎস্য চাষের উপযোগী জলভূমি, খাসপুকুর ইত্যাদি মৎস্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে।

মৎস্যবিভাগ এই সমস্ত জলাভূমি, খাসপুকুর ইত্যাদি কেবলমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করবে। ভূমিহীন মৎস্যজীবী এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারদের এই সমস্ত সমবায়ে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. শহর এলাকায় (পৌর কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা) কোনো পরিবার একাধিক বাড়ির মালিক থাকতে পারবে না। ভবিষ্যতে শহর পৌর-কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য জমির পরিমাণ নিম্নলিখিত হারে নির্ধারণ করতে হবে।

(ক)	ঢাকা	পাঁচ কাঠা।
(খ)	১। চট্টগ্রাম	সাড়ে সাত কাঠা।
	২। নারায়ণগঞ্জ	,,
	৩। খুলনা	,,
	৪। রাজশাহী	,,

(গ) সকল জেলা শহর (খ-তে উল্লেখিত শহর ছাড়া) দশ কাঠা

(ঘ) সকল মহকুমা শহর (সাড়ে বারো কাঠা)।

(ঙ) অন্যান্য পৌর এলাকা পনেরো কাঠা।

৮, রেজিস্ট্রিবিহীন কবুলিয়ত দাখিলাপত্র ও পাট্টার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ড দেয়া হয়েছে তা বাতিলপূর্বক খাস খতিয়ানভুক্ত সরকারী জমিতে পরিগণিত করতে হবে।

৯, সাধারণের ব্যবহার্য খাল, বিল, রাস্তা এবং গোরস্থানের রেকর্ড, বন্দোবস্তি ইত্যাদি বাতিল করতে হবে।

১০, ভূমিহীন কৃষকদের নামে যেসমস্ত সরকারী খাসজমি ভূমি-মালিক এবং টাউট শ্রেণী বন্দোবস্তি নেয়ার মারফতে ভোগ দখল করছে তাঁদের বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন করতে হবে।

১১, সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রতিটি গ্রামে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সন্তানদের এই সমস্ত সমবায়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

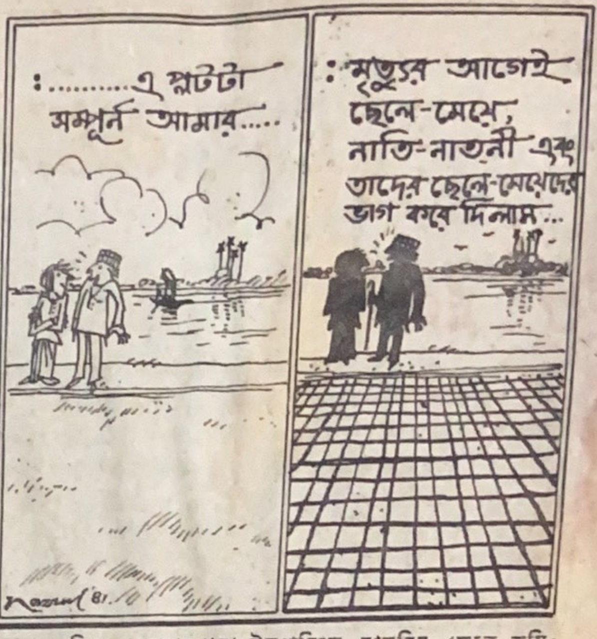
:.........এ প্লটটা সম্পূর্ন আমার.....
: মৃত্যুর আগেই ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের ভাগ করে দিলাম...

১২, শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদিতে চাকরির ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য প্রতিটি থানাকেন্দ্রে দক্ষ শ্রমিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১৩, কৃষি জমিকে বসতবাড়িতে পরিণত করবার প্রবণতা কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৪, উপকূল এলাকায় বনাঞ্চলের জন্য রক্ষিত ভূমি অথবা বনাঞ্চল গড়ে তোলা প্রয়োজন—এই জাতীয় ভূমির ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার বন্দোবস্তি বাতিলপূর্বক বন-সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৫, খুলনা থেকে চট্টগ্রাম-এর দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত সাগর হতে ভূমি উদ্ধারের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে হবে।

১৬, রেলবিভাগের আওতাভুক্ত আবাদযোগ্য পতিত ভূমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক-পরিবারের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭, তিন একর কৃষিভূমিকে অর্থনৈতিক ইউনিট হিশেবে গণ্য করতে হবে।

১৮, কৃষি জমির অধিক বিভক্ত রোধ করবার জন্য কার্যকরী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১৯, কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ এবং বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২০, ভূমির কার্যকারিতা, অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনাপূর্বক সমবায়ের জমির পরিমাণ স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সমুদয় ভূমিকে সমবায়ভুক্ত করে নিতে হবে।

২১, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ভূমি প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে।

২২. ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্য বর্তমান ব্যবস্থা বাতিলপূর্বক প্রতি ইউনিয়নে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ব্যাংকের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

২৩. দেশ-ব্যাপী শস্যবীমা চালু করতে হবে।

২৪. বন-সংরক্ষণ এবং বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বর্তমান প্রচলিত বন-আইন বাতিলপূর্বক যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২৫, ভূমি রেকর্ড ও ভূমি জরিপ সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৬, অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচ হতে উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে বন্টন করতে হবে।

২৭, ভূমি-মৃত্তিকা জরিপের আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনপূর্বক ভূমি উপযোগী শস্যের চাষাবাদ এবং উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২৮. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চাহিদা, উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ এবং বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করতে হবে।

২৯, জমির অধিক বিভক্তিকরণ রোধ করার জন্য বিশেষ করে অর্থনৈতিক ইউনিট রক্ষা করার স্বার্থে জমির বেচা-বিক্রি পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

৩০, শিল্প ও কলকারখানার নামে দখলীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

৩১, কৃষিসংক্রান্ত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩২, কৃষি উৎপাদনে ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চত করবার জন্য প্রয়োজন হলে আইনগত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

দল কিংবা সরকারী মনোভাব

বিএনপি'র কার্যনির্বাহী কমিটি কিংবা ক্ষমতাসীন সরকার উপরোক্ত রিপোর্ট অথবা সুপারিশ কতোটা গ্রহণ-বর্জন করবেন এবং কতোটা কার্যকর করবেন। আমরা জানি না। তবে ইতিমধ্যেই জনাব একরামউল্লাকে আহ্বায়ক করে ভূমি সংস্কার বিষয়ক আর একটি দ্বিতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব এস, এ, বারী এটি, কৃষি মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুনীল গুপ্ত, প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, মিসেস জাহানারা বেগম, জনাব গোলাম মুর্তাজা ও জনাব হারুন-অর-রশীদ এই কমিটির সদস্য। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, এই কমিটির তিন-চারটে মিটিং এরমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি এ-যাবৎ কোনো রিপোর্ট তৈরি না করলেও, আগের রিপোর্ট বাতিল না করে এঁরা সেটি সক্রিয় বিবেচনায় রেখেছেন। এ-সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে আমরা দলীয় নেতা ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু উদ্ভূত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কারণে আপাতত কেউই মুখ খুলতে চান না। পরে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারলে, আমরা অবশ্যই তা পাঠকদের জানাবো।

উপরোক্ত কার্যক্রম থেকে বোঝা যায়. বর্তমান সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভূমিব্যবস্থা ও সংস্কার সম্পর্কে, কম হোক বেশি হোক, আশু পরিবর্তনের খুবই পক্ষপাতী। ভূমি ও কৃষি সংস্কার সম্পর্কে সরকার বিশেষত মরহুম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে সংসদের বিরোধীদল ও গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এসব বৈঠকে অধিকাংশ সরকার ও বিরোধীদলীয় ব্যক্তিই ভূমি ও কৃষি সংস্কারের প্রশ্নে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরেছেন। বিশেষ ক'রে সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি ও কৃষি সংস্কারের একটি খসড়া প্রস্তাব, যা প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার ভাষায় 'টকিং পেপার', পেশ করা হয়েছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিভিন্ন সংসদীয় দলের নেতৃবৃন্দ কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছানোর আগে 'টকিং পয়েন্টস' (আলোচনার বিষয়বস্তু)-কে কৃষি সংস্কার সম্পর্কে সরকার প্রণীত প্রস্তাব হিশেবে ধরে নেয়া উচিত হবে না। এটা সাধারণের জন্যে নয় এবং বর্তমান পর্যায়ে প্রকাশের উদ্দেশ্যে করাও হয়নি। তবে প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তি হিশেবে সংসদ ভবনের কমিটি রুমে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ৯ই সেপ্টেম্বরে পেশ করা এই ভূমি ও কৃষি সংস্কার প্রস্তাবগত সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতও হয়েছে। এই খসড়া প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হয়েছে। ভূমি সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের জন্যে ভূমি সংস্কারের সপক্ষের কল্যাণকামী অংশের হাত লাগানো দরকার। বাংলাদেশে ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদাররা সংগঠিত শক্তি নয়। কাজেই কল্যাণকামী সংগঠনগুলোই তাঁদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে পারে। রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকার নিজে তাঁদের সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

আমাদের কথা

অতীতে বহুবার বিভিন্ন সরকারের আমলে ভূমি সংস্কারের ঘন-ঘন শ্লোগান ও বিপ্লবী ডাক, কখনো সিলিং কখনো আইল ভাঙবার হাঁকডাক বা বর্গাপ্রথার বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর কথাবার্তা এবং আশ্বাস দেয়া হয়েছে, যা প্রকারান্তরে আমাদের ভূমি সংস্কার ও কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই জন্ম দিয়েছে এই সুদূর গভীর অনিশ্চয়তার। অথচ আমাদের বর্তমান ভূমিব্যবস্থা ও মালিকানা. জমির খণ্ডীকরণ—আলাদাভাবে ও একক উদ্যোগে চাষাবাদের প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। এতে অর্থনৈতিক খামার, যৌথ খামার, সমবায়ী খামার প্রভৃতি গ'ড়ে তোলার এবং আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ানোর অবকাশ কম। কেন না আমাদের জমির পরিমাণ কম, মালিকানা স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ. বরং ভূমিহীন অনেক বেশি। বর্তমানে কৃষকদের একক ও বিচ্ছিন্নভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এতে বিনিয়োগ ক্ষমতা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধ কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হয়, উৎপাদনও মার খায়। এসব অপরিহার্য ও যুক্তিসঙ্গত কারণে কৃষি ও ভূমিব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার অত্যাবশ্যক।

২৭·৮·৮০ তারিখে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হযেছে, নানা বাধাবিপত্তি ও বিতর্ক সত্ত্বেও শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার অনেক দেশেই দারিদ্র্য লাঘবে নিশ্চিত সহায়ক হয়েছে।

আমরা নিশ্চিত, ভূমিব্যবস্থা ও কৃষির সংস্কার আমাদেরও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোচনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে।

নির্মলেন্দু গুণ

ময়মনসিংহের নজরুল

ত্রিশালে, কাজির সিমলায় তুমি আজো সেই
পনেরো বছর বয়সের
দুরন্ত কিশোর
হ'য়ে আছো।

আজো সেই প্রথম দিনের মতো,
তোমার পথের পানে চেয়ে
থেমে আছে
অশান্ত সময়।

হোক না তা ক্ষণস্থায়ী, তবু,
তুমি এসেছিলে, এই গর্ব
আজো তার প্রধান সঞ্চয়।

কাজী রফিজউল্লাহ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমাদের সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা
আজ আপনার বিদেহী আত্মাকে
ভালোবেসে,
অভিবাদন জানাচ্ছে।

বৃটিশ রাজত্বে দারোগা বৃত্তির
সকল কলুষ থেকে,
আমরা সবাই আজ
আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছি।
আপনি এখন,
সকল কালিমা থেকে মুক্ত—নিষ্কলুষ, মহাপ্রাণ।

অতিচেনা একটি মুখের পাশে আজ সারাপথ
আমি যখনই,
বাসের জানালা দিয়ে
বাইরে
তাকিয়েছি—

একটি অচেনা মুখ বারবার এসে
কল্পনায় হানা দিয়ে গেছে।
কৃতজ্ঞতাস্নাত, স্নেহবৎসল
সেই মুখ আপনার।

চাকরির ছুটি হ'লে পর মূল্যবান বিলাস সামগ্রী নিয়ে
সবাই যে যার বাড়ি ফেরে,
এটাই নিয়ম, স্বাভাবিক।

অথচ আপনি;
একজন রাজকর্মচারী হয়ে
বাড়ি ফেরার সময়
আসানসোলের রুটির দোকান থেকে সাথে ক'রে
আনলেন এক অদ্ভুত সওদা;
পনেরো বছর বয়সের ডাগর চোখ ও ঝাঁকড়া চুলের
এক কিশোর শ্রমিক;
কাজী নজরুল ইসলাম।

আহা কি নামের ছিরি।
শুনলেই বোঝা যায় লোকটা মোটেও সুবিধের নয়।
তবু, এক টুকরো পরশ পাথরের মতো,
আপনার চোখে
পড়লো তাকেই।

বলিহারি চোখ আপনার।
যে লোকটা ১৯২২ সালে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ
আপনারই মতো
অন্য এক দারোগার হাতে
গ্রেফতার হবে কুমিল্লায়—১৯১৪ তেই কি আশ্চর্য
স্নেহের কড়ায় বন্দী ক'রে
আপনি,
তাঁকে নিয়ে এলেন কাজির সিমলায়।

আপনি জবর দারোগা হে!
কাজীতে-কাজীতে খুব যথার্থই মিলেছিলো বটে।
মনে হয়, শঠ:পরিবৃত এই বঙ্গদেশে শুধু একবারই শালুক
চিনেছিলো গোপাল ঠাকুর।

[দুই]

খুবতো ছিলেন আসানসোলের রুটির দোকানে
একটাকা মাইনের ছেঁদো কর্মচারী,
দারোগা সাবের
স্নেহ-বদৌলতে—
হলেন দরিরামপুরের ছাত্র।
কিন্তু সেই সুখ সইলো না আপনার ভাগ্যে।
কার সাধ্য বাঁধে আপনাকে? কার এতো প্রেম?
হোক না তা যে কোনো শিকল।
বিদ্রোহের রক্ত যাকে পায় সে এমনি ক'রে যায়।
ইস্কুলের পাঠ্যসূচী, যাবতীয় স্নেহের বাঁধন, আর
ত্রিশালের সুনিশ্চিত
ডাল-ভাত রেখে
কাউকে কিচ্ছুটি না ব'লে আপনি
ময়মনসিং ছেড়ে
পালিয়ে গেলেন বর্ধমান।

বলি প্রেসিডেন্সী জেলের খাবার, সেকি
ভালো ছিলো ত্রিশালের চেয়ে?
কিংবা কলকাতার ঐসব মোল্লা পুরোহিতদের অর্বাচীন
গালমন্দ?
তার অগ্রবাতী ধেনো-মদ?
ভালোই হয়েছে। আমাদের ক্ষতি হয়নি কিছুই।
আমরা পেয়েছি,
উচ্ছন্ন আবীরে ঢাকা বিদ্রোহের অগ্নিদগ্ধ কালবৈশাখীর
রুদ্র আকাশের মতো
প্রসারিত,
জ্যোতিষ্মান এক
সাম্যবাদী কবি।
আর হতভাগ্য, আপনি, পেয়েও হারালেন
কবিবৎসল ত্রিশালের এই
উন্মুক্ত আহ্বান।

[তিন]

সেই থেকে ৬১ বছর পর, ১৯৭৫-এ আপনার সাথে
যখন আমার মুখোমুখি দেখা হ'লো,
তখন, তেত্রিশ বছরের
মৌন-যন্ত্রণার গহীন নিঃশব্দ বুকে চেপে,
নবজাত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীর
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট হাসপাতালের
একটি নির্জন কক্ষে
ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে,
মগ্ন
ছিলেন আপনি।
বাইরে গ্রীষ্মের রোদ, খাঁ-খাঁ করছে হাওয়ায়,
আর অভ্যন্তরে আপনার কক্ষের দরোজা ঘেঁষে
সশস্ত্র পুলিশ,
পাহারায় রত।
দর্শনার্থীদের অনাহুত ভিড় এড়ানোর জন্যই যদিও
এ-ব্যবস্থা, তবু,
মনে হলো এ-ও আপনার আরেক দুর্ভাগ্য।
এ-ও এক কারাগার।
আমি গেছি অসময়ে, ভর দুপুর বেলায়।
হঠাৎ,
আপনাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হলো, তাই।
ডেটলের গন্ধেভরা হাসপাতালের ফাঁকা কোরিডোরে,
এই কক্ষটির ভিতরে আছেন
নজরুল;
ভাবতেই বুকের ভেতরে ঝলকে উঠলো একরাশ রক্ত
সেই রক্ত বিদ্রোহের উষ্ণতায় মাখা,
সেই রক্ত আপনার।

পুলিশ বললো: "এখন হবে না"।
আমি বললাম: "আলবৎ হবে।"
দৃঢ় চিত্ততার সে কি আশ্চর্য সুফল।
খুলে গেলো পাষাণ দরোজা—আপনাকে দেখলাম,
শুভ্রচাদরে আবৃত বিছানায় উপবিষ্ট
এক স্মৃতিভ্রষ্ট কবি;
অস্ফুট শব্দের মালা গেঁথে চ'লেছেন আনমনে।
তাঁর আগত নয়নে রুদ্র বৈশাখের অস্তন্মুখ মুখ সূর্য,
কপালে নির্বাক বলীরেখা—
যেন পদাঘাতে বিদীর্ণ সৈকত।

শোকাচ্ছন্ন বক্ষের পিঞ্জরে অব্যক্ত ব্যথায়
শ্বাসাঘাত,
কণ্ঠে মৃত গানের কোকিল,
তার উজ্জ্বল কালো শিরা।
সহসা চকিতে দৃষ্টি ফেরালেন আপনি আগন্তুকের দিকে।
শিশুর সারল্যে ধোয়া সেই অসহায়,
অবাক চাহনি,
আহা কি নিষ্ঠুর ভগবান!
হায় কি করুণ সেই দেখা!

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

চিলেকোঠার সেপাই

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইসব হৈ-চৈ ও লোকজনের মাঝামাঝি হাতে-কাচা ঘি রঙের শার্ট ও সবুজ চেক-চেক লুঙির ভেতর থরথর করে কাঁপে রঞ্জুর বাবা। শরীর কাঁপার প্রতিক্রিয়ায় বা ভয় কিম্বা দুঃখ প্রকাশ করার জন্য তার ঠোঁটও একটু-একটু কাঁপে। তাকে দেখেই ওসমান ওপরের দিকে তাকায়। রঞ্জুদের বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানু। রানুর মুখ ভয়ানক ফ্যাকাশে। সে নিশ্চয় খুব ভয় পেয়েছে। নিজের চারপাশের কোলাহল ওসমানের কানে বাজতে শুরু করে। আবহসঙ্গীতের মতো, এসব ছাপিয়ে কানে আসে রানুর মিনতি, 'আপনে এট্টু কন না! এই ছেলেদের কন না। আব্বারে মিটিঙে নিলে কিচ্ছু বলতে পারবে না, আব্বা এক্কেবারে শাদাসিধা মানুষ! আব্বারে আপনে ঘরে দিয়া যান।' ওসমান ফের ওপরে তাকায়। না, তার দিকে রানুর কোনো লক্ষই নেই! কিছুক্ষণ দাঁড়ালে রানু নিশ্চয়ই তাকে দেখতো। দেখলেই নিশ্চয়ই বলতো, 'আপনে এই ছেলেদের একটু বলেন না।' কিন্তু লোকজনের জটলা এগিয়ে চলেছে, ওসমানকেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয়। ওসমান ভাবে, যাই, রানুকে বলে আসি, আমি তো আছি। তোমার বাবাকে আমি দেখবো। তুমি মিছেমিছি ভেবো না।—কিন্তু রানুর সঙ্গে এইসব কথাবার্তা বলার বা তার ওপর রানুর আস্থা উপভোগ করার কপাল কি ওসমানের হবে? লোকজন শালা ছুটছে।

জটলার মধ্যে থেকে হঠাৎ শ্লোগান ওঠে, 'শহীদের রক্ত'—'বৃথা যেতে দেবো না।' ওসমান পাশে তাকিয়ে দ্যাখে খিজির এই শ্লোগান শুরু করেছে। এরপর শ্লোগান ওঠে, 'আবু তালেবের রক্ত'—'বৃথা যেতে দেবো না।' এরকম দু'তিনবার শ্লোগান দেওয়ার পর খিজিরের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন'! কিন্তু এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। সে ফের চেঁচায়, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন!' এবার জবাব আসে, 'ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক!' তারপর ফের শ্লোগান ওঠে, 'মাহাজনের জুলুম মাহাজনের জুলুম'—'চলবে না চলবে না।' খিজির এবার একটু থেমে শ্লোগান তোলে, 'মানুষরে ডাইকা বেইজ্জত করা'—জবাব আসে 'চলবে না, চলবে না!' পাড়ার ছেলেরা সব মজা পেয়ে গিয়েছে। খিজির আলীর রাগ মনে হয় তারা উপভোগ করে। রঞ্জুর বাবার ঠোঁট কিন্তু আরো তীব্রবেগে কাঁপে। এরা কি তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করছে? আলাউদ্দিন মিয়া খিজিরের দিকে তাকিয়ে একটু থামে। মিছিল এগিয়ে চলে। ওপরের দিকে চামড়া জড়ানো হাড্ডিসর্বস্ব হাত-ওঠানো খিজির তার সামনে এলে আলাউদ্দিন মিয়া চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'খ্যাঁচরামো করনের জায়গা পাইলি না চুতমারানি? এইগুলি কি কস হারামজাদা এইগুলি কি? খামোশ থাক!'

কিন্তু আনোয়ার এগিয়ে আসে, বলে, 'কেন? মহাজন না বাড়িওলা তো বেশ খারাপ ব্যবহারই করেছে। তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিলে ক্ষতি কি?'

খিজির আলী ভরসা পেয়ে বলে, আমি তো তাই-কই, রঞ্জুর বাপে মঞ্চের উপরে খাড়াইয়া কউক, আমারে মাহাজনে লইয়া গিয়া বেইজ্জত করছে। আপনারা বিচার কইরেন।'

আনোয়ার বলে, 'হ্যাঁ, বলুক না! আইয়ুব খান মোনেম খানের লোকাল এজেন্টদের এক্সপোজ করা দরকার। এরা তো সব এক্সপ্লয়টেশনের মিডিয়া। এই ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, সেই কথাটা মিটিঙে বলতেও দেবে না? কি অডাসিটি! শয়তান!'

আলাউদ্দিন মিয়া কিন্তু আনোয়ারের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাকায় খিজিরের দিকে। সে এমন কটমট করে তাকায় যে মনে হয় খিজিরকে আচ্ছা করে পেটাতে পারলে তার শরীরটা জুড়ায়। কিন্তু সে চাকরের গায়ে কখনো হাত তোলে না, পারতপক্ষে মুখও খারাপ করে না। তাহলে কি খিজির আলীকে আজ বরখাস্ত করে দেবে? তবে আপাতত সেসব কাজ স্থগিত রেখে সে আনোয়ারকে বলে, 'আপনেরা আমাগো মহল্লার খবর রাখেন না, তাই এইগুলি কন! রহমতউল্লা সর্দাররে ওপেনলি কনডেম করলে মহল্লার মইদ্যে রি-এ্যাকশন খারাপ হইবো, বুঝলেন না? রঞ্জুর বাবায় ইষ্টেজের উপরে খাড়াইয়া কইবো কি তার পোলারে

পুলিসে গুলি করছে! তার পোলায় মইরা গেছে বইলা তার পরিবারে কি মুসিবত নাইমা আসছে—এইগুলি! আমাগো দরকার পাব্লিকের সিমপ্যাথি, না কি কন?'

আনোয়ার তবু গোঁ ছাড়ে না, বলে, 'স্টেজে উঠে কান্নাকাটি করে লাভ কি? স্টেজে তো নাটক হচ্ছে না, পাব্লিক কাঁদানো আমাদের কাজ নয়। বরং মাহাজনের শয়তানিটা এক্সপোজ করলে কাজ হবে। কি বলো, আলতাফ?' তারপর ফের আলাউদ্দিন মিয়াকে বলে, 'ঐ লোকটাকে এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? এদের রুট তো কেঁপে গেছে, বুঝতে পাচ্ছেন না?'

কিন্তু আলতাফ খুব বিরক্ত হয়। আনোয়ারের কথা সে থামিয়ে দেয় প্রায় ধমক দিয়ে, বলে, 'তুমি কিচ্ছু বোঝো না। এই এরিয়ায় ঐ সর্দারের ইনফ্লুয়েন্স সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা নেই। এখানকার সিচুয়েশন এঁরা তোমার আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝবেন। মিছেমিছি হঠকারিতা করা ঠিক হবে না। এই আলাউদ্দিন সাহেব কবে থেকে পলিটিকস্ করছেন, জানো?'

'ঐগুলো রাখেন। ঐ কথা কইয়া কি হইবো?' আলাউদ্দিন মিয়া আলতাফকে থামিয়ে দেয় বটে, কিন্তু আবার নিজেই বলে, 'মুসলিম লীগের এগেন্সটে কথা কইলে যহন গুনা হইতো, বুঝলেন গুনা হইতো, জামাতে নমাজ পড়বার দিতো না, আমরা তহন পিচ্চি আছিলাম, তহন থাইকা চোঙা ফুঁকতাছি, তহন মুজিব ভাইয়ের পিছে খাড়াইছি, অহনও তার পিছনেই রইছি।' একটু থেমে সে ফের বলে, 'মহল্লার মইদ্যে কার কি রকম ইজ্জত আমরা জানি না?'

কথা বলতে বলতে কোলাহল করতে করতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পার্কের ভেতর থেকে বক্তৃতার আওয়াজ কানে আসে। সামনে যেতে যেতে বক্তৃতার কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়, 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি আমাদের ওপর অত্যাচারের যে ষ্টীমরোলার চালিয়ে আসছে যতই দিন যাচ্ছে উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। এই পশ্চিমা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের কবল থেকে সোনার বাংলাকে বাঁচাতে হলে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সর্বাত্মক সংগ্রামে। ভাইসব, গত তেইশ বছর থেকে বাঙলার সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে, বাঙলাকে শোষণ করে গড়ে তোলা হচ্ছে করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ।

বাঙলার কৃষক আজ পাটের দাম পায় না, বাঙলার ছাত্রসমাজ এখানে তৈরী কাগজ কেনে বেশি দামে, একই দেশে দুই অঞ্চলে সোনার দাম দুই রকম! ভাইসব, এই শোষণ ও জুলুমের প্রতিকার দাবী করলে পশ্চিমা শাসকশ্রেণী আমাদের ওপর লেলিয়ে দেয় তাদের কুকুর পুলিস বাহিনী মিলিটারী, ই, পি, আর। খাদ্য চাইলে আসে বুলেট। পশ্চিম পাকিস্তানের মরু ভূমিতে আজ যখন ফসল ফলে খাল কাটা হয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সে সব কাদের টাকায়? আর বাঙলার দীর্ঘদিনের সমস্যা বন্যা সমস্যা আজও অবহেলিতই রয়ে গেলো। ভাইসব আমরা বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছি, রক্ত দিয়েছি বাষাট্টিতে রক্ত দিয়েছি, উনসত্তরের শুরুই তো রক্তপাতের মধ্যে।'

বাহাদুর শাহ পার্ক ভর্তি কেবল মানুষ। শহীদ মিনারের বিশাল বেদীতেও অনেক লোক। এদের বেশির ভাগই বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মী। বেদীর চারদিকে সিঁড়িতেও ছেলেরা বসে রয়েছে। কারো-কারো হাতে পোস্টার-সাঁটা বাঁশের চাটাই। পার্কের ভেতর থেকে লোকজন উপচে পড়ছে বাইরে, দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথেও দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে। পুর্বদিকের গেটের ফুচকাওলা, ঘুঘনিওলাদের সরে যেতে হয়েছে ওপারে ইসলামিয়া কলেজের গেটে। এখান থেকে ঠিক উল্টোদিকে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে দুটো ট্রাক। ট্রাকের ওপরে রাইফেল হাতে সদাপ্রস্তুত পুলিসবাহিনী। শীতের বিকালবেলাটা গড়িয়ে পড়ছে এই পার্কে, শেষ-রোদ লেগে শহীদ মিনারের চূড়া লালচেশাদা রঙে হাসছে। মাইকে এখন অন্য একটি কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'সাম্রাজ্যবাদ শক্তি আজ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র মানুষের বাঁচার শেষ অবলম্বনটুকুও কেড়ে নেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাকিস্তানে তাদের পা-চাটা দালাল আইয়ুব খান এবং তার চেলাচামুণ্ডাদের দিয়ে এদেশের মানুষকে শোষণ করে চলেছে। এদেশের সাধারণ মানুষের পেটে আজ অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই। ঋণ ও সাহায্য নেওয়ার নাম করে সাম্রাজ্যবাদের কুকুর আয়ুব খান দেশকে দেশের জনসাধারণকে বন্ধক দিয়ে রেখেছে তার প্রভুর কাছে। মানুষকে আর কতোকাল ধোঁকা দেওয়া চলবে? আজ বিশ্বের সর্বত্র,—এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় নিরন্ন মানুষ জেগে উঠেছে। আজ সাম্রাজ্য বাদীদের দালাল এদেশী মুৎসুদ্দীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে! কৃষক, শ্রমিক আজ সচেতন হয়েছে—।'

পার্কের ভেতরে ঢুকতেই কয়েকটি ছেলে এসে বলে, 'আলাউদ্দিন ভাই, ওপরে আসেন।' আলাউদ্দিন মিয়া একটু গম্ভীর এবং একটু হাসি-হাসি মুখ করে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। তারপর ঐ অবস্থাতেই দুই পাশে দেখতে-দেখতে সে সিঁড়ি দিয়ে বেদীতে ওঠে। আলতাফ একটু হেসে আনোয়ারের দিকে তাকায়। একটি ছেলে এসে আলতাফকে বলে, 'আলতাফ ভাই, যান ওপরে যান।' আলতাফ গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, 'ছাত্রদের মিটিং, আমরা শুনতে এসেছি।' সে বেশ জোরে এই কথাগুলো বলায় আলাউদ্দিন মিয়া একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। তারপর বেদীতে অন্যান্যদের পাশে নিয়ে আসন গ্রহণ করে।

আলাউদ্দিন মিয়ার পেছনে পেছনে খিজিরও সিঁড়িতে উঠে পড়েছে। হঠাৎ তার বোধহয় খেয়াল হলো, সে আর না উঠে

ওপরের দিকে একটি সিঁড়ির ধাপেই বসে পড়ে। খিজির মিয়ার পাশাপাশি ছিলো রঞ্জুর বাবা। সে বেচারা বসবে না আরো ওপরে উঠবে বুঝতে না-পেরে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলো। আলাউদ্দিন মিয়া উঠে দাঁড়িয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তার পাশাপাশি একজনকে ডেকে কি বলে আর সেই উদ্যোক্তা বক্তৃতারত ছেলেটাকে সরে যেতে বলে। সে বক্তৃতা অব্যাহত রাখতে চায়, বলে, 'ভাই-সব, আমি আর একটি কথা বলেই বিদায় নেবো। আমি আর বেশি কথা বলবো না। আমি কেবল এই বলতে চাই যে আমাদের দুঃখ দুর্দশার মূলে আমাদের এই ঘুণে-ধরা পচা সমাজ-ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদ শক্তি চায় না যে আমরা এই সমাজ-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হই। তাই তাদের দালালদের দিয়ে তারা—।' কিন্তু তার বক্তৃতা আর শোনা যায় না। মঞ্চের নিচেই একটি জটলার স্লোগান শুরু হয় যে, 'জাগো-জাগো'—'বাঙালি জাগো'; 'পিণ্ডি না ঢাকা'—'ঢাকা ঢাকা'; 'তোমার আমার ঠিকানা'—'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'; 'স্বায়ত্বশাসন স্বায়ত্বশাসন'—'দিতে হবে দিতে হবে'; ছয় দফা এগারো দফা'—'মানতে হবে মানতে হবে'; 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'—'মানি না মানি না'।

এর মধ্যে অন্য একটি ছেলে মাইকের সামনে এসে পড়েছে। তারপাশে রঞ্জুর বাবা; রঞ্জুর বাবার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলাউদ্দিন মিয়া। নতুন ছেলেটি মাইকে বলে, 'ভাই-সব, আপনারা বসে পড়ুন বসে পড়ুন। আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এক শহীদ ভাইয়ের পিতা। আপনারা জানেন,' এখানে বক্তা হঠাৎ বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করে যে তার কথা বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ে। সে বলে, 'আইয়ুব-শাহী আজ সংগ্রামী জনতার রুদ্র রূপ দেখে ভীত হয়ে পড়েছে। তার লেলিয়ে দেওয়া পুলিস, মিলিটারি ও ই.পি,আর দেশের সর্বত্র মানুষের ওপর নির্যাতন শুরু করেছে। মানুষ হত্যা করা আইয়ুব শাহীর নেশায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি আমরা জানি, আমরা জানি—'তার জ্ঞাত বিষয় বলার সুযোগ সে পায় না। আর একজন এসে মাইকের সামনে দাঁড়ায় এবং বলে, 'গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে পুলিসের গুলিতে নিহত ওয়াপদায় তরুণ কর্মচারী আবু তালেবের বাবা এখন আপনাদের সামনে কিছু বলবেন।' কিন্তু এইপর্যন্ত বলে এ ছেলেটিও উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বলতে শুরু করে, ভাইসব এইসব শহীদের ত্যাগ কখনো বৃথা যেতে পারে না। এইসব শহীদ তাদের প্রাণ দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে গেলো—।' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণ দিকের গেটের পামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে-থাকা জটলা থেকে স্লোগান ওঠে, 'শহীদের রক্ত' 'বৃথা যেতে দেবো না'; 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ'—'নিপাত যাক'; 'দুনিয়ার মজদুর'—'এক হও,' 'কেউ খাবে কেউ খাবে না'—'তা হবে না তা হবে না'; 'জোদ্দারের গদিতে'—'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো' 'মিল মালিকের গদিতে'—'আগুন জ্বালো একসাথে'। এইসব স্লোগান চলছে, তখন আবার বেদীর নিচের সেই জটলা থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে কয়েকজনের স্লোগান ওঠে, 'বাঙলার মজদুর'—'এক হও এক হও।' 'ছয় দফা ছয় দফা'—'মানতে হবে মানতে হবে'; 'শেখ মুজিবের'—'মুক্তি চাই'। দক্ষিণ দিক থেকে তখন ফের স্লোগান ওঠে, 'এগারো দফার সংগ্রাম'—'চলবে চলবে'; 'সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা'—'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার'।

দুটো জটলার স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গি এমন যে মনে হয় তারা যেন স্লোগান ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। এদের স্লোগান আর থামে না। শ্রোতারা সব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, মিটিং একটি অনিশ্চিত অবস্থায় এসে পড়েছে, এমন সময় খিজির আলী প্রায় বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ায়। মঞ্চে সবাই শিক্ষিত লোকজন বসে রয়েছে। সবাই ইউনিভার্সিটি বা কলেজের ছাত্র, অন্ততঃ সবাই ভদ্রলোক তো বটেই।

এদের মধ্যে সে দাঁড়ালেও কেউ তাকে খেয়াল করে না, কারণ যেভাবে স্লোগান-পালটা স্লোগানে চলছে তাতে মিটিং শেষপর্যন্ত টেকে কি না সেই চিন্তায় সবাই অস্থির। আলাউদ্দিন মিয়াও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো বৈকি। সে জানে, এই সব ক্ষেত্রে শুধু শব্দবাণের ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ছাত্রদের মধ্যে কি ধরনের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে কে জানে? কর্মীরা কখন যে কি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করবে।—এই শালার ইউনিভার্সিটিতে বৎসরের পর বৎসর ল´ ক্লাশে পড়ে থাকা নেতারা তা একবারো আঁচ করতে পারে না। আলাউদ্দিন মিয়া তাই খিজির আলীকে একটু ইঙ্গিত করেছিলো, তার সামনেই সে যেন একটু আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু হাড্ডি শালার বুদ্ধিটা দ্যাখো।—ব্যাটা হঠাৎ হাত দিয়ে মাইকের ষ্ট্যাণ্ড ধরে ফেললো। তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দেবে বলে আলাউদ্দিন মিয়া উঠে দাঁড়াচ্ছে এমন সময় হাড্ডি খিজির চিৎকার শুরু করে, 'ভাইসব, ভাইসব, আপনেরা খালি-খালি চিল্লাচিল্লি করেন ক্যালায়? খামোস মাইরা মিটিং হোনবার পারেন না? পাঁচজনে দশজনে একলগে নামছেন, চিল্লাচিল্লি করবেন তো খালি হাউকাউ হইবো, ঝগড়া ফ্যাসাদ হইবো, কাম হইবো আপনার কলাটা! একলগে কাম করেন, হাউকাউ কইরেন না। অহন ভাষণ দিবো আমাগো মহল্লার মতলুব আলী সাব। আপনারা তো জানেন, ইনার পোলারে হালায় পুলিসে গুলি কইরা মাইরা ফালাইছে।' খিজির আলীর দৈর্ঘ্য ও কৃশতা, তার কাটখোট্টা চেহারা বা তার পোড়া-পোড়া গায়ের রঙ বা পানের রসে লাল-না-হয়ে কালচে হওয়া পুরু ঠোঁট বা তার ঘোরতর স্থানীয় উচ্চারণ ভঙ্গিতে শ্রোতাদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু হয়। আলাউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলে, 'ল' হইছে, অহন যা।' কিন্তু বোকাসোকা খিজির সবাইকে নিজের কথা শোনাবার তাগিদে ফের চিৎকার করে, 'ভাইসব, পুলিসের জুলুমের কথা কন, মগর মহল্লার মইধ্যে জুলুম—আরো বড়ো জুলুম—।' এইকথা শেষ হবার আগেই আলাউদ্দিন মিয়ার প্রায়-

ধাক্কায় সে নিচে নামে। লোকজন তখন খুব হাসছে। যারা তাকে চেনে তারা হাসছে। তারা তো জানেই যে হাজি খিজির কোনো গোলমাল দেখলেই সেখানে গিয়ে হাজির হবে। শ্রোতাদের বেশির ভাগই তাকে চেনে না, তারাও খুব হাসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা তার উচ্চারণ ভঙ্গি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ ভ্যাংচাতে শুরু করে। খিজির যখন বেদী থেকে নিচে দাঁড়ায় তখন অনেকেই তাকে ছাখার জন্য নিজেদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় কিম্বা অন্তত ঘাড়টাড়গুলো একটু এদিক-ওদিক করে। তার প্রতি কৌতূহল বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু তার চেহারা, উচ্চারণ ও কথা থেকে মানুষ যে মজা পেয়েছে তার রেশ থেকেই যায়। আনোয়ার ও আলতাফ স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে আড়ষ্ট হয়ে পরস্পরের দিকে না তাকাবার চেষ্টা রপ্ত করছিলো। খিজিরের কমন কৌতুকবোধে দু'জনেই সহজ হলো, নিজেদের মধ্যেও তারা হাসাহাসি করে। ওসমানও জোরে-জোরে হাসে। স্লোগান বন্ধ করে সবাই বলতে গেলে নিজেদের অজান্তেই খিজিরের আহ্বান মেনে নিয়েছে। তবে তার আহ্বান সম্পূর্ণ মেনে নিলে কাজের মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু খিজিরের ঐ চেহারা ও অভিব্যক্তিতে যে কথা বেরিয়ে আসে, তাও আবার হাস্যকর ভঙ্গিতে, তাতে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তার রিক্‌শাওলা, স্কুটার ড্রাইভার সহকর্মী, এমন কি ঠেলা গাড়িওলা, ছোকরা সিগ্রেটওলা, বুটপালিশওলারাও এই চেহারার মানুষের এই ভঙ্গি ও উচ্চারণে ডাক-দেওয়া কোনো আহ্বানে সাড়া দিতে পারতো না। তবে খিজির আলীর প্রতি ঠাট্টা, কৌতুক ও বিদ্রূপের সাধারণ অনুভূতিতে পার্কের লোকজন এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছেলেদের পরস্পরের প্রতি তেতো মনোভাব স্থগিত রইলো। তারা কিছুক্ষণ খুব মজা লুটে নিয়ে ষ্টেজের দিকে তাকিয়ে থাকে। শহীদ আবু তালেবের বাবার নাম যে মতলুব আলী—এই তথ্যও কিন্তু খিজিরের কল্যাণেই জানা গেলো। কিন্তু এ-জন্য খিজিরের প্রতি মনে-মনেও কেউ ধন্যবাদ দেয় না।

মতলুব আলী এখন মাইকের সামনে। লোকটি কথা বলতে পাচ্ছে না। জিভ দিয়ে কেবল ঠোঁট মোছে। সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো পাতলা ঠোঁট দেখে ওসমান গনি একটু চঞ্চল হলো। তার নাকের নিচে ছোটো-ছোটো গোঁফের ওপর ঘাম জমেছে। পেছন থেকে একজন তরুণ নেতা বলে, 'বলেন না, বলেন না। আপনার ছেলে মারা গেছে বলেন।' মতলুব আলী বলে, 'আমার ছেলে আবু তালেব গত মাসের ৮ তারিখে দুপুরে, বেলা ১টার দিকে নিউমার্কেটের সামনে, নীলখেতের মোড়ে পুলিশের গুলিতে'—

পেছন থেকে তরুণ ছাত্র-নেতা বলে, 'বলেন মিছিল থেকে—।' মতলুব আলী বলে, 'মিছিল থেকে মারা গেছে।' তারপর সে চুপ করে থাকে। তরুণ নেতা বলে, 'বলেন আইয়ুব-মোনেমের লেলিয়ে দেওয়া পুলিস আমার ছেলেকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।' দু'তিনবারের প্রচেষ্টায় মতলুব আলী সম্পূর্ণ বাক্যটি ঠিকঠিক বলে ফেলে। তরুণ নেতা তখন ফের প্রম্পট করে, 'বলেন, আমার একটি ছেলে গেছে, এই শোক আমার জন্য মারাত্মক, কিন্তু আমার ছেলের মতো হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ছেলে বেঁচে আছে।' মতলুব আলী এই দীর্ঘ বাক্যটিও মোটামুটি বলতে পারলো। কিন্তু পেছনে প্রম্পটারের দিকে কান না দিয়ে সে হঠাৎ কেঁদে ফেলে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার আর একটি ছেলে বেঁচে আছে, ক্লাস নাইনে পড়ে, তাকে যদি বাঁচাতে না পারি। তারে ক্যামনে বাঁচাই? ক্যামনে বাঁচাই?' সে এখন ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, তার কথা কিছু বোঝা যায় না। সে চোখে হাত দেয় না; নাক থেকে, চোখ থেকে পাতলা জল গড়িয়ে পড়ছে, সেসব মোছবার চেষ্টাও করে না। জনসভা নির্বাক হয়ে তার কান্নাজড়ানো ধ্বনি শোনে। বেদী থেকে দু'তিন ধাপ নিচে দাঁড়িয়েছিলো খিজির আলী। মতলুব আলীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'মাহাজন আপনারে বেইজ্জত করছে, কন না। আরে কন না। কান্দেন ক্যালা? কান্দেন ক্যালায়?'

কিন্তু মতলুব আলীর শোকে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী তখন কেঁপে উঠেছে, অন্য কারো কথায় কান দেবে কে? ওদিক আলাউদ্দিন মিয়া মতলুব আলীর পাশে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ে আলগা করে হাত রাখে। শোকতপ্ত লোকটি একটু ঝুঁকে পড়ে। তারপর আলাউদ্দিন মিয়ার বুকে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

খিজির আলী বেশ উত্তেজিত। তার ঠোঁট এমন তীব্রভাবে কাঁপে যে মনে হয় হঠাৎ মুখ থেকে খসে নিচে পড়ে যাবে। এই অস্থির ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসে, 'কান্দেন ক্যালায়? কথাটা কইবার পারলেন না? কন না। কিয়ের ডর? ব্যাকটি মানুষ আমাগো লগে আছে বোঝেন না? কান্দেন ক্যালায়?' খিজিরের আশে-পাশের লোকজনও অন্যান্য সকলের মতো শোক ও বেদনায় বুঁদ হয়েছিলো। খিজিরের এইসব বিড়বিড় কথাবার্তায় তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। একজন বলে, 'আঃ।' আরেকজন বলে, 'থামো না।' খিজির আলী তখন চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে-নামতে বলে, 'দূর।' হনহন করে হেঁটে পূর্বদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মতলুব আলী তার বুকে মুখ রাখায় আলাউদ্দিন অভিভূত হয়ে পড়েছে। সকলের দৃষ্টি এখন তার দিকেই। মতলুব আলীর প্রতি সে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

পুত্রশোক লাঘব করা তো তার সাধ্যের বাইরে। অন্তত কোনো না কোনোভাবে তাকে সাহায্য করার জন্যে সে দায়িত্ব অনুভব করে। মতলুব আলীকে জড়িয়ে ধরে বেদীতে বসতে-বসতে আলাউদ্দিন মিয়া বলে, 'একটু শক্ত হইতে চেষ্টা করেন।' কিছুক্ষণ পর বলে, 'ভাইবেন না, রহমতউল্লা সর্দাররে আমি সামলাইয়া রাখুম।'

মগরেবের নামাজের বিরতির পর নতুন উদ্যমে মিটিং শুরু হয়।

[ক্রমশ]

সাক্ষাৎকার

কবি আবদুল কাদিরের মুখোমুখি কিছুক্ষণ

দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর বয়সেও কবি আবদুল কাদির বিন্দুমাত্র টলেননি, বলা যায় পুরোদস্তুর সামর্থ্য এক ব্যক্তি—তাঁর রক্ত-মাংসপেশী এখনও উজ্জ্বল তারুণ্যের আচরণগুলো ধারণ ক'রে আছে। তাঁর কথাশুনে মনেই হয় না যে তাঁর মধ্যে দীর্ঘ-বয়সের আড়ষ্টতা আছে, ক্লান্তির কোনো ছাপ আছে। শুধু চোখে পুরু কাঁচের চশমা আর মাথায় পাকা চুল এ-দুটো লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় কবি আবদুল কাদিরের বয়স হয়েছে।

এ-ছাড়া সবকিছুতেই, বিশেষ করে মন-মানসিকতায় এখনও তিনি তরুণ—দীর্ঘ বার্ধক্যের ছিটেফোঁটা চিহ্নও তার মধ্যে নেই।

এইতো কয়েকদিন হয়েছে মাত্র কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে তাঁর বাসায় (মধুবাজার) গিয়ে দেখা করেছিলাম। যতোক্ষণ তাঁর মুখোমুখি বসে কথা বলেছি, বিভিন্ন প্রশ্ন করেছি ততোক্ষণ আমার মনে হয়েছে বয়স তাঁকে একটুও কাবু করতে পারেনি। শক্ত মেরুদণ্ডের অধিকারী তিনি। কি সাহিত্যকর্মে কি গৃহকর্মে উভয়ক্ষেত্রে সক্ষম সচল, একজন কৃতী পুরুষ হিশেবেই তাঁকে আমরা দেখছি। তাঁর জন্যে সত্যি বলতে কি, আমরা গর্বিত।

কবি আবদুল কাদিরের জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১লা জুন ১৯০৬ সাল। জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আড়াইসিধা গ্রাম। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি মধ্য ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা উচ্চবিদ্যালয় থেকে। এরপর তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ করে ১৯২৩ সালের দিকে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে পড়ার সময় আবদুল কাদির কবি স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর কাব্যচর্চার প্রথমদিকে তিনি কাজী আবদুল ওদুদ এবং 'দীপিকার'র সম্পাদক শ্রী পরিমল কুমার ঘোষের সাহচর্য লাভ করেন। দীপিকা পত্রিকায় আবদুল কাদিরের বেশ ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এছাড়া কল্লোল, কোহিনূর, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়।

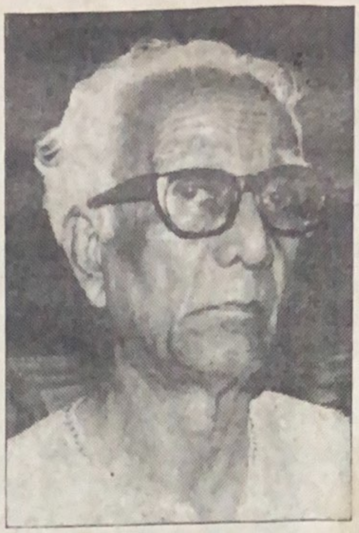

এ-পর্যন্ত আবদুল কাদিরের দু'টি কবিতার বই বেরিয়েছে। প্রথম কবিতার বইয়ের নাম দিলরুবা। এর প্রকাশকাল ১৯৩৩। দ্বিতীয় কবিতার বই উত্তর বসন্ত, বেরিয়েছে ১৯৬৭ সালে। দিলরুবা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিলো: 'তোমার দিলরুবা বইখানি পড়ে খুশি হলাম। ভাষা এবং ছন্দে তোমার প্রভাব অপ্রতিহত। তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর গতিবেগ কোথাও ক্লান্ত হয় না। বাংলার কবি সভায় তোমার আসনের অধিকার অসংশয়িত।'

যার ছন্দজ্ঞান নেই তার কবিতা লেখা অনুচিত এক প্রশ্নের উত্তরে এই অভিমত ব্যক্ত ক'রে আবদুল কাদির বললেন, কবিতাচর্চার জন্য ছন্দজ্ঞান আবশ্যক। আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে আবদুল কাদির বললেন, এ-দেশের কবিতায় যদি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যথাযোগ্য প্রতিফলন ঘটে, তা হলেই তা হবে প্রকৃত অর্থে আধুনিক এবং সেই আধুনিক কবিতা হবে সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের আত্মার আহার্য ও আনন্দের সামগ্রী।

মুসলিম সাহিত্যসমাজ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে আবদুল কাদির বললেন, ১৯২৬ সালে মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো সার্বজনীন কল্যাণ এবং প্রগতি বয়ে আনা। আমরা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে বিস্তৃত এবং বাস্তবায়িত করার জন্য 'শিখা' পত্রিকা বের করি। এই পত্রিকায় শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ-ই প্রাধান্য পেতো; এতে গোড়াপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। বিশেষ ক'রে মুসলিম সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাসখানেক আগে, স্যার আবদুর রহীম নিখিল ভারত মুসলীম লীগের আলীগড় সম্মেলনে যখন বললেন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্ছে উর্দু—ঠিক তখনই, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি।

'বুদ্ধিমুক্তি'ভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে কারা জড়িত ছিলেন জানতে চাইলে কবি আবদুল কাদির বললেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, অধ্যাপক সৈয়দ মোতাহার হোসেন এবং আমি নিজে। আমাদের এই সাতজনকে ঐ সময় একত্রে সপ্তর্ষি বলা হতো।

যথেষ্ট বয়সী হওয়া সত্ত্বেও কবি আবদুল কাদিরকে একজন জীবন্ত মানুষ বলে মনে হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্ন ক'রে যেটুকু জানা গেছে তাতে তাঁকে একজন আধুনিক রুচির মানুষ বলে স্বীকার করতে মোটেও কষ্ট হয় না।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যে যেমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে স্বীকার করেন তেমনি রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নেও সমাজতান্ত্রিক মানবতা এবং বৈপ্লবিক গণতন্ত্রকে স্বীকার করেন।

কবি আবদুল কাদির তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিপূর্বে একুশেপদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার নজরুল একাডেমী স্বর্ণপদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিলো: আপনার অবসরজীবন কিভাবে কাটে? চট ক'রে আবদুল কাদির উত্তর দিলেন: আমি তো এখনও সচল—তাই অবসর সময় কাটানোর অবকাশ আমার নেই। আমার হাতে সময় খুবই কম, বলতে গেলে একদম নেই, সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকি। ইদানীং বাংলাকাব্যের প্রাচীন ছন্দ নিয়ে কাজ করছি।

ইবনে বতুতা

সাহিত্যের খবর :

আলাওল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মোহাম্মদ রফিকের সংবর্ধনা

বাঙালীর হৃদয়ে কবিতার স্থান অন্য যে কোনো কিছু অপেক্ষা যে অনেক উর্ধ্বে তা আরেকবার প্রমাণিত হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরায়ণ সংসদ আয়োজিত সদ্য আলাওল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মোঃ রফিকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবারে ছিলো এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয় নির্ধারিত সময় সকাল ১০টার প্রায় ঘন্টাখানেক পরে। অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশমুখে রঙীন হস্তাক্ষরে "উত্তরায়ণ সংসদের শুভেচ্ছা"—এই কথাটুকু লিখিত এক-টুকরো আয়তকার আর্ট পেপারের ওপর ষ্টেপলার পিন দিয়ে আটকানো দু'-তিন রকমের ছোট-ছোট ফুল সম্বলিত একখানি মনোরম শুভেচ্ছাপত্র দিয়ে নিমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথমপর্বে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী-এবং আমন্ত্রিত সুধীদের সম্মুখে উত্তরায়ণ সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয়পর্বে ছিলো আলোচনা অনুষ্ঠান।

আলোচনার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী। সম্ভবত আসাদ চৌধুরীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে বলে সেদিন তিনি ভীষণ মুডে ছিলেন। শ্রোতারা বক্তৃতারত এবং মঞ্চে উপবিষ্টাবস্থায় তাঁকে কারণে-অকারণে সর্বক্ষণই হাসতে দেখেছেন। আসাদ চৌধুরী সংবর্ধিত কবি প্রসঙ্গে বলেন, মোঃ রফিক একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতার ভাষা সম্পূর্ণ নিজস্ব জগতের। মোঃ রফিকের কবিতায় শব্দপ্রয়োগ অন্য কবিদের চেয়ে পৃথক এবং অনন্য যা আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

ঘড়ির কাঁটায় নজর যদিও ছিলো না তবুও নির্বিঘ্নে বলতে পারি প্রখ্যাত কবি রফিক আজাদ মাইকের সামনে ছিলেন বড়জোর ৪ মিনিট। স্বভাবসুলভ অনুচ্চস্বরে তিনি কথা বলেছেন অনেকটা আনমনে। মোঃ রফিকের সঙ্গে তাঁর নামের মিতালীর সাথে হৃদয়েরও যে গভীর সখ্যতা রয়েছে বার দু'য়েক তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি নিজে দু'-চারটে কবিতা লিখি বলেই অন্যের কবিতা কিছুটা বুঝি। সেকারণেই জানি মোঃ রফিক একজন অসাধারণ কবি। আমাদের কবিতার জগতে মোঃ রফিক একটি ব্যতিক্রম সংযোজন।

সংবর্ধিত কবির কলেজ শিক্ষক এবং এ-অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, আজকাল বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারে রাজনীতির প্রভাব এতো বেশি যে পুরস্কৃত ব্যক্তির পরিচিতি অভিধান খুলে দেখতে হয়। কিন্তু সেদিক দিয়ে প্রতি দু'বছর অন্তর-অন্তর আলাওল পুরস্কার উপযুক্ত পাত্রে দিয়ে ফরিদপুরের আলাওল সাহিত্য-গোষ্ঠি ব্যতিক্রম নজির স্থাপন করছেন। এবং এবারের এই আলাওল পুরস্কার মোঃ রফিক পেয়ে নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মোঃ রফিক প্রকৃতই একজন সৌভাগ্যবান কবি। তাঁর মতো প্রতিভাবান কবি খুব একটা দেখা যায় না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান সংবর্ধিত কবি স্মিত হাস্যমুখে শ্রোতাদের চমৎকার বক্তব্য উপহার দেন। তিনি বলেন, "আমাকে নিয়ে এই যে এতোসব হট্টগোল, আমার কাছে এ-সব বেশ অদ্ভুত লাগছে। সেই ছোটবেলা থেকেই মনে হতো আমি বাজে লিখি এবং এখনও তা বিশ্বাস করি। কবি এবং অধ্যাপক এ-দুটোতেই আমি ব্যর্থ বলেই আমি আজকাল ব্যর্থতার আনন্দ উপভোগ করি।" মোঃ রফিক মঞ্চে উপবিষ্ট রফিক আজাদ ও আসাদ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বলেন, আসুন আমরা কবিতার জগতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করি, অন্তত আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই স্রোতের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে।

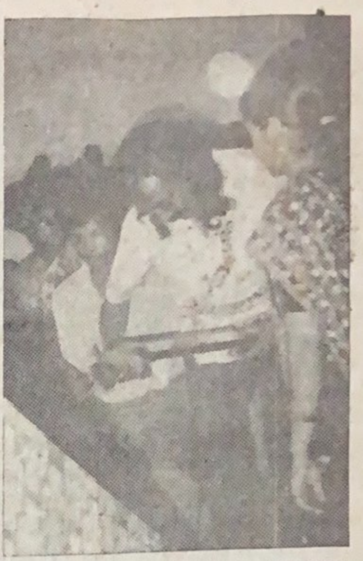

সংবর্ধনাপত্র গ্রহণ করছেন মোহাম্মদ রফিক

অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং খ্যাতনামা নাট্যকার সেলিম আল-দীন বলেন, মোঃ রফিকের কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে এতোখানি উজ্জল যে, তাঁর যে কোনো কবিতায়, কবির নামটি যদি ঢেকে রাখাও হয় তারপরও কবিতা পড়ে খুব সহজেই বলে দেয়া যাবে এটা 'মোঃ রফিকের' কবিতা।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে ছিলো মনোজ্ঞ স্বরচিত কবিতাবৃত্তির আসর। আবৃত্তিকারদের প্রায় সকলেরই চমৎকার বাচনভঙ্গি ও নিপুণ আবৃত্তি শ্রোতারা প্রাণভরে উপভোগ করেন এবং মুহুর্মুহু করতালিতে চতুর্দিক ভরিয়ে তোলেন। কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন সর্বজনাব রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, কাজী রোজী, মাহবুবা হক, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নাসির আহমদ, কামাল চৌধুরী, মোঃ রফিক, আল-আমিন মীর আনিসুল হক প্রমুখ।

পুরো অনুষ্ঠানটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নাজমুল হাসান। এছাড়াও মামুন, খোকন, রিয়াজ, মনির, দোহা, সোহেলা, মিলি প্রমুখ হাসিমুখে সর্বক্ষণ তৎপর ছিলেন অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করতে। পরিশেষে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উত্তরায়ণ সংসদকে একরাশ ধন্যবাদ।

ফাহিমুল কাদির

বিজ্ঞান

বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ

সম্প্রতি বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। তাঁদের সফরসঙ্গী হয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত ভূ-পদার্থবিদ প্রফেসর পল মেলচিয়র। ২১শে মে প্রফেসর মেলচিয়র বাংলাদেশ জিয়োফিজিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতা করেন ; আণবিক শক্তি কেন্দ্রের ও সেমিনার রুমে। প্রফেসরের বক্তব্যের বিষয় ছিলো ভূ-আকৃতিবিদ্যা (জিয়োডেসী) ও ভূ পদার্থবিদ্যা গবেষণায় কতিপয় সমস্যাবলি।

প্রফেসর মেলচিয়রের লেকচার শুনতে-শুনতে বারবার মনে পড়ছিলো যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের ওপর যেসব বক্তব্য রেখেছিলাম আমি—তা কতো সত্যি। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপে ভূ-পদার্থবিদ্যার গুরুত্ব এবং ভূ-পদার্থবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে পারস্পারিক পরিপূরকতার প্রয়োজনীতা বিশ্লেষণ করে অতীতে যেসব যুক্তি রেখেছিলাম, তারই প্রতিধ্বনি প্রফেসর মেলচিয়রের ভাষণে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

গত ২৪ ও ২৫-শে মে সেমিনার হয় উন্নয়নের স্বার্থে শক্তির ওপর। উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি একমাত্র খুব সত্যি কথা বলেছেন যে, জ্বালানি নিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে। জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে দেশীয় এবং ব্যক্তিস্বার্থও যে বিষাক্ত ভাইরাসের মতো জাতীয় উন্নয়ন ও আর্থ-কাঠামোকে বিপর্যস্ত করছে—সে কথা তিনি বলেননি।

ব্যক্তিগত স্বার্থ যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোন পর্যায়ে যে নিয়ে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ। এই বিভাগটির সীমাহীন দুর্নীতি এবং লুটপাট তাই কোনো ভালোকাজের উদাহরণ দেখাতে পারেনি। এমন কি জনৈক ভূ-তত্ত্ববিদ সিরাজ আবদুল্লাহ বিভাগটির বিরুদ্ধে আনীত তত্ত্ব ও অভিযোগগুলো খণ্ডনের পরিবর্তে চার পাতার ফুলস্কেপ কাগজে বিস্তর আজেবাজে কথা লিখেছেন। তলিয়ে ফেলেছেন ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-বিদ্যার মধ্যকার ব্যবধান।

প্রফেসর মেলচিয়রের বক্তৃতায় যা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো অর্থাৎ আধুনিকযুগে খনিজসম্পদ আহরণে ভূ পদার্থীয় জরিপের অপরিহার্যতা—সেই একই কথা বলেছিলেন লণ্ডনের আইজিএস এর ভূ পদার্থবিদ মিঃ ইভান্স। তিনি ১৯৭৭-এ বাংলাদেশে এসেছিলেন রংপুর-দিনাজপুর প্রজেক্টের কাজে। ১৯৭৮ সালে রাজশাহী-বগুড়া প্রজেক্টের কাজে এসেছিলেন একজন সোভিয়েত ভূ-তত্ত্ববিদ। সম্ভবত ১৯৭৮-এ এসেছিলেন এস্কাপের একজন ভূ-রসায়নবিদ। তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে ভূ-রসায়নের প্রয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাই করতে। ১৯৮০-তে এসেছিলেন একজন আমেরিকান ভূ-তত্ত্ববিদ। ১৯৭৮-৭৯-র দিকে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিম জার্মানী থেকেও এসেছিলেন মিঃ ফ্রেডারিকসন নামক একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার।

এঁরা সবাই এসেছিলেন বাংলাদেশে কাজ করতে। পারেননি। সবাই বলে গেছেন সর্বাগ্রে ভূ-পদার্থীয় জরিপ ও কাজকর্মগুলো হওয়া উচিত। অস্ট্রেলিয়ার মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার একটি ভূ-পদার্থীয় প্রোগ্রামও পাঠিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞদের অভিন্ন মতামত ও বক্তব্য গৃহীত হয়নি। তাই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার মতো দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থই সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

শুধু আন্তর্জাতিক চক্রান্তই আমাদের পঙ্গু করে রাখেনি। দেশের ভেতরে স্বদেশীরাও ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে নির্মমভাবে ঘৃণ্য উপায়ে ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রপতি স্বদেশী চক্রান্তের উল্লেখ করেননি। স্বদেশী চক্রান্তকারীরা ভারি নির্লজ্জ। তাই অভিযোগ ও তথ্যগুলোকে এড়িয়ে এবং সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও সত্য নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই প্রতিবাদপত্র পাঠাবার ধৃষ্টতা দেখায়। আমাদের জাতীয় চরিত্র কোথায় নেমে এসেছে, কতো অধঃপতন হয়েছে আমাদের—তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন হয় না।

প্রফেসর মেলচিয়র এবং উপরে বর্ণিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন ভূ-তত্ত্ববিদ সৈয়দ মাজহারুল হক। সৈয়দ মাজহারুল হকের 'ভূ পদার্থী জরিপ এবং বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আহরণে এর ভূমিকা' নামক নিবন্ধটি ছাপা হয়েছে বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকার মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৬ বাংলা সনে। প্রথম দিকটার কয়েকটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছিলো।

—বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আহরণে কেন ভূ-পদার্থবিদ্যার প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

সৈয়দ মাজহারুল হক তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের ভূ-স্তরের উপরে কোথাও আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলার অস্তিত্ব নেই। তাই অতীতে ডঃ ক্রুকস্যাঙ্কের মতো নামী ভূ-তত্ত্ববিদ (দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন ডাঃ স্যাঙ্ক) পর্যন্ত বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিগত তিনদশকে বাংলাদেশে ভূ তাত্ত্বিক এবং ভূ-পদার্থীয় জরিপ হয়। বাংলাদেশে ৮টি গ্যাসফিল্ড আবিষ্কার হয়েছে ভূ-পদার্থীয় জরিপের অন্তর্গত ভূ কম্পন পদ্ধতিতে জরিপের ফলেই। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ যেখানে ব্যর্থ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীরে জরিপ চালাতে অপারগ, সেখানে ভূ-পদার্থীয় জরিপই অপরিহার্য। ভূ-পদার্থীয় জরিপের সাহায্যেই ভূ পৃষ্ঠের অনেক গভীরে অবস্থিত বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা নিরূপণ করা হয়েছে। ফলে, লাভ হয়েছে প্রচুর। বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠে আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলা না দেখে একসময় অনেক নামী, প্রথিতযশা ভূ-তত্ত্ববিদরা অনায়াসে রায় দিয়েছিলেন খনিজ সম্পদ লাভের অনম্ভাব্যতার পক্ষে। ভূ-পদার্থীয় জরিপ তাঁদের রায় ভুল প্রমাণ করে ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে কওোয়ানা কয়লা (জামালগঞ্জ), গ্যাস, শাদামাটি ইত্যাদির সন্ধান দিয়েছে।

ভূ-পদার্থবিদ্যা এবং ভূ-তত্ত্ব—এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হোক, আমরা চাই না। আমরা চাই জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাক। আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আগেও ছিলো, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। ভূ-পদার্থবিদ্যা ও ভূ বিদ্যা পরস্পরের পরিপূরক হিশেবে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে কাজ করুক তা-ই চাই আমরা।

কিন্তু আমাদের ইচ্ছা কতোটুকু কার্যকর হবে? দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে সংশয় আরো ঘনীভূত হয়।

না. ম.

চিত্রকলা

মিনাক্ষী ধরের একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

চটগ্রামের নবীন চিত্রশিল্পী মিনাক্ষী ধরের তিনদিনব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী গত ৩রা মে শেষ হলো।

স্থানীয় প্রেসক্লাবে ১লা মে বিকেলে শিল্প-অনুরাগী প্রচুর দর্শকের উপস্থিতিতে মিনাক্ষী ধরের মোট ৫৮টি চিত্র-কর্মের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর কলা অনুষদের ডীন ডঃ আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহিম।

শিল্পী বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি এঁকে থাকেন। নিজের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে মিনাক্ষীর বক্তব্য : "আমার এ-যাবৎ কালের ছবিগুলোকে এক করে শিল্পরসিক ও দর্শকদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছি। ছবিগুলো যদি কাউকে কিঞ্চিৎ আনন্দও দিয়ে থাকে তবে তার প্রাপ্যটুকু তাদের— যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রদর্শনী। আর যাবতীয় নিন্দার প্রাপ্য আমার নিজের।

মিনাক্ষী ধর হচ্ছেন প্রথম ছাত্রী চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী হিশেবে যার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। তবুও তাঁর ছবি দেখে বলতে হয় শিল্পচর্চায় নিষ্ঠার সাথে তার অন্তরের যোগ রয়েছে।

মিনাক্ষী ধর

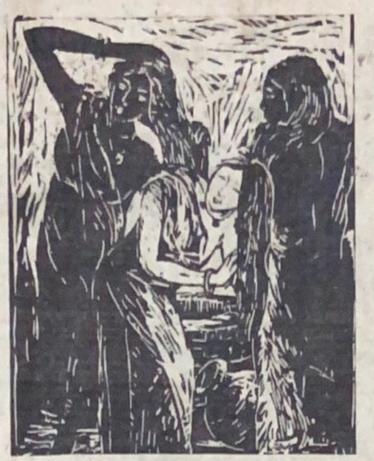

কাঠ খোদাই

শিল্পীর ৫৮টি ছবি প্রেসক্লাবের দেয়ালে সুন্দর ক'রে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো মিনাক্ষী তাঁর অনুভূতিগুলো দর্শকমনে রঙ-তুলির সাহায্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ৫৮টি চিত্রের মধ্যে ২৭টি তৈলচিত্র, ১৮টি কাঠ-খোদাই, ৮টি কোলাজ, ৭টি পেন্সিল ও ১টি পেষ্টেলে অঁাকা।

জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দুটোই তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। সব ছবির মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব প্রিয় ছবি হচ্ছে পেষ্টেলে অঁাকা লালনের একতারা। এ-ছাড়া জীবন এতো ছোট কেন, আমেজ, হলুদ আবর্তে, বেলা শেষে, আকাঙ্ক্ষিত দিনগুলো, (তৈলচিত্র) স্নানরতা রমণী, না সজনী না (কাঠ-খোদাই) ইত্যাদি ছবিগুলোর কথা উল্লেখ করতেই হয়। অবশ্য ভালো লাগার মতো আরো কিছু ছবিও ছিলো। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সাধনার শেষ নেই। সারাজীবন একজন শিল্পী শিক্ষার্থীই থেকে যায়। শিল্পী হিশেবে মিনাক্ষী ধর যথেষ্ট সম্ভাবনাময়ী।

মিনাক্ষী ধর বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগে এম, এ, অধ্যায়নরতা। ইতিপূর্বে সে শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নবীন শিল্পীদের ভ্রাম্যমান চারুকলা প্রদর্শনী, বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের বার্ষিক প্রদর্শনীসহ বেশ কয়েকটি যৌথ প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছে।

এতোদিন সে বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করলেও বর্তমানে শুধু পেন্টিং নিয়েই কাজ করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে জানালো, ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করার ইচ্ছে আছে। চট্টগ্রামের মেয়ে মিনাক্ষী ধর ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। গতবছর শ্রী নীলাদ্রীদের [illegible] বিয়ে হয়েছে।

ধাঁধা

প্রশ্ন :

১) আমেরিকার কোন্ প্রেসিডেন্ট তিনবার নির্বাচিত হয়েছিলেন?

২) ক্রিষ্টালফোবিয়া কি?

৩) রেড সিন্ধী কি?

৪) তাজমহলের নক্শা কে ক'রেছিলেন?

৫) মরফলজি (Morphology) বলতে কি বুঝায়? ঐ পরিভাষা কে তৈরি করেন?

৬) কম্বন কে ছিলেন?

৭) উপমহাদেশের একজন দাবা-র গ্রাণ্ড মাষ্টার উপাধি লাভ করেছিলেন। নাম কি?

৮) কিছুদিন আগে ঢাকার একটি প্রেক্ষাগৃহে হিচ্ককের 'স্পেলবাউণ্ড' ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। ঐ ছবির শিক্ষা নির্দেশক ছিলেন একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তাঁর নাম?

৯) মার্ক্সের সম্পূর্ণ নাম কি?

১০) 'বাংলাদেশ স্বপ্নদ্যাখে' কি বিষয়ক গ্রন্থ?

◆

উত্তর :

১। রুজভেল্ট।

২। কাঁচ ভাতি।

৩। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের এক জাতীয় গাভী।

৪। তাজমহলের নক্শা করে ছিলেন ওস্তাদ ঈসা।

৫। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অঙ্গসংস্থান বিদ্যাকে মরফলজি Morphology বলে।

ঐ পরিভাষা জর্মান কবি গ্যাটে তৈরি করেন।

৬) তামিল কবি। তিনি তামিল ভাষায় প্রথম রসায়নের অনুবাদ করেন।

৭। পাঞ্জাবের সুলতান খান।

৮। সালভাদর ডালি।

৯। কার্ল হেনরিখ্ মার্ক্স।

১০। কবিতা-গ্রন্থ শামসুর রাহমানের।

মূকাভির্নয়

আলীমুজ্জামান

একটি বনাঞ্চল। ঘন গাছ-গাছালিতে ঠাঁসা বুনোট সূর্যের আলো বড় কষ্টে ফাঁক-ফোকর গলিয়ে এ-বনকে আবছা আলো-আঁধারীতে রহস্যময় ক'রে তোলে। একজন মানুষ, হ্যাঁ মানুষ—উস্কো-খুস্কো কাঁধঅবধি পাখির-বাসা চুল—রুক্ষ, লাল। রুক্ষ, লাল চঞ্চল সন্ধানী ঈগল দু'চোখ, তামাটে গায়ের রঙ, উলঙ্গ এ-আদিম মানব এ বনেরই একধারে একটি ছোট্ট ঝর্ণার কাছে এসে আঁজলা ভ'রে পানি খায়। পানি খেয়ে ফিরে আসতে গিয়ে তার সন্ধানী ঈগল দু'চোখ সামনে ছুটে যায়। বনাঞ্চলের ছোট-ছোট গাছ-গাছালি নড়ে, কেবলি নড়ে মৃদু চঞ্চল। আর কিছু না; আর কিছু দেখা যায় না। ঝটিতে আদিম মানব নিজেকে আড়াল করে জঙ্গলে, গাছের আড়ে। কান পেতে থাকে অপেক্ষায়—পাতার, ছোট ছোট শুকনো ডালের মড়মড় ধ্বনি কানে আসে। যখন খুব স্পষ্ট, খুব কাছেই শব্দ—সন্তর্পণে আদিম মানব চোখ রাখে শব্দের সন্ধানে। তার রুক্ষ, কঠিন চেহারায় আস্তে-ধীরে ফুটে ওঠে কোমলতা, মোহ ও প্রেম। শব্দের ঠিকানায় যে আছে দাঁড়িয়ে—.সে তো কেবলি কাছে ডাকে—আয়। ঝর্ণার দিকে ছুটে আসতে গিয়ে পাশেই যখন মড়মড়, খসখস শব্দ—আদিম মানবী ঘুরে থমকে দাঁড়ায়। তার রুক্ষ, কঠিন ও ঈষৎ ভীত চেহারা আস্তে-ধীরে কোমল হয়ে ফুটে ওঠে, চোখের তারায় আদিম মানব প্রেমিক হয়ে কেবলি হাত বাড়ায়—এসো, প্রিয়তমা এইখানে এই বুকে এসে কান পেতে শোনো—প্রথম দেখাতেই আমি ভালোবেসেছি তোমাকে—এসো, হ্যাঁ এগিয়ে এসো কাছে, আরো কাছে……।

অচেনা পৃথিবীতে মানুষ যখন অসহায় খুব। যখন খুব অনাদরে লালিত মানুষ। মানুষের মুখে যখন ফোটেনি ভাষা—মানুষ কি তখন ভালোবাসেনি?—সবচাইতে অসহায়, নিরুপায়, নির্মম কঠিন কঠোর এ সত্য থেকে—ভালোবাসা থেকে কি করে পালাবে মানুষ। মুখের ভাষা নেই তবু মানুষ বলেছে—প্রিয়, প্রিয়তমা আমি ভালোবাসি তোমায়। মুখে ভাষা নেই তবু ভালোবাসার কথা মানব মানবী জেনেছে দু'জনেই, দু'জনেই বুঝেছে—দু'জনকেই দু'জনের চাই ……।

হাত, পা—অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তিই তখন মানুষের মনের ভাষা ফুটিয়ে তুলেছে, সে ভাষা চোখের আলোয় পড়ে মানুষ বুঝেছে মানুষকে, মানুষের কথা ও মনোভাবকে। এবং এইভাবেই মানুষ এগিয়েছে। অচেনা পৃথিবী শুধু চেনাই নয়—মানুষ নিজের মুঠোয় পুরে নিয়ে পৃথিবীকে এখন যেমন ইচ্ছে তেমন গড়ছে, ভাঙছে—আবার গড়ছে। এই ভাঙা-গড়ায় মানুষ নিজেকেও ভাঙছে, গড়ছে। মুখের ভাষার সুর পাল্টাচ্ছে—রঙ পাল্টাচ্ছে। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাষা এখন। আধুনিক থেকে আধুনিকতর। কিন্তু যে ভাষা সেই আদিকাল থেকে মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, মূক-মুখর সেই ভাষা—জন্মগত ও প্রকৃতিপ্রদত্ত বলেই মানুষের অজান্তেই মানুষের জন্যেই রয়ে যায় একান্তে, নিবিড় হয়ে।

মৌন মুখর কথকতা

পৃথিবীতে যখন মানুষ এলো তখন মানুষের মুখে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা ছিলো কিন্তু সেই শব্দকে ভাষায় প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতা মানুষের ছিলো না। চোখের ইশারায়; হাত নেড়ে কিংবা শরীরের ভঙ্গীমায় মানুষ তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতো, বোঝাতে চেষ্টা করতো। মূক ভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ Gesture। ল্যাটিন শব্দ Jestus থেকে এর উৎপত্তি। "Jestus হচ্ছে To move or to act to convey a feeling or a mimatic expression through the action of head and. eyes।" এই সংজ্ঞায় প্রাচীনতম মূকাভির্নয়কেই বোঝানো হয়েছে। মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভাষার যে সীমাবদ্ধতা তা' সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়: ভাষার বাইরে ও পরিবেশগত' অভিব্যক্তির সুন্দরতম প্রকাশ ঘটে। অভিব্যক্তি ছাড়া শুধুমাত্র কথার উচ্চারণেই ভাব-প্রকাশকে পরিপূর্ণ রূপ দেয় না। অভিব্যক্তিহীন কথা উচ্চারণ কল্পনা করাই একেবারে অসম্ভব। 'কেউ প্রচণ্ডভাবে রেগে গিয়ে কাউকে কিছু বলছেন'—ভাষা যাই থাকনা কেন ক্রোধের অভিব্যক্তি যদি চোখে-মুখে বা সর্বাঙ্গে ফুটে না ওঠে. তো সে ব্যক্তিটিকে

নিশ্চয়ই একটি 'রবোট' ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র ইঙ্গিত ও অভিব্যক্তিই অনেক সময় ভাব-প্রকাশের পরিপূর্ণতাকে ধারণ করতে পারে। এই বোধ থেকেই 'মূকাভিনয়ে'র সৃষ্টি। বলা যায়—'মানুষের যে কোনোরকম ভাব-অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারে একমাত্র অভিব্যক্তি দ্বারা মানুষের অন্তরে আবেগ ও উৎকণ্ঠা সুখ, দুঃখ, উল্লাস ও আতঙ্ককে জীবন্ত করে তোলার এবং শুধুমাত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিঃশব্দ সঞ্চালনের দ্বারা গতিশীল জীবনের কোনো রূপ ও আকার ফুটিয়ে তোলার যে অভিনয় শিল্প-কৌশল তাকেই বলে Pantomime বা 'মূকাভিনয়।' অবশ্য এই সংজ্ঞাটুকু মূকাভিনয়ের ব্যাপকতাকে ধারণ করে না। মূকাভিনয় অবশ্যই ভাষাহীন অভিব্যক্তির প্রকাশ, কিন্তু শুধুমাত্র অভিব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়। নাটকে যেমন বিশেষ একটি কাহিনী থাকে এবং সংঘাতের দ্বারা সেই কাহিনী বিন্যাস্ত হয়ে একটি বিশেষ ক্লাইমেক্সে পৌঁছায়, তেমনি মূকাভিনয়ের বেলায়ও কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

নাটক, মূকাভিনয় ও মূকাভিনেতা

নাচ, গানের মতো সূক্ষ্ম শিল্পকলা এবং দর্শন ও মনস্তাত্ত্বের মতো বিভিন্ন শিক্ষা শাখার সঙ্গে নাটকের কোনো যোগ সূত্র নেই। নাটকের অভিব্যক্তি মনের আবেগকে খুব সহজে আন্দোলিত করতে পারে। মন—একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো, যেখানে অভিনেতাদের কোনো বিশেষ 'পাঠ' থাকে না। এখানে নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের (মনে) অঙ্গ-ভঙ্গীর অভিব্যক্তির মাধ্যমে কাহিনী বা গল্প ফুটে ওঠে। মনের অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অপরের কাছ থেকে অনুকরণ করে নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

'মূকাভিনয়' বা 'বোবা' অভিনয় গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সময় থেকে শুরু হয়। সাহিত্যের অঙ্গ হিশেবে 'মূকাভিনয়' সর্ব প্রথম খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে ইটালীতে আত্ম-প্রকাশ করে। একই সময়ে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে মূকাভিনয়ের প্রসার ঘটে। দৈনন্দিন জীবনের শাদা-সিধে বাস্তব ঘটনা নিয়ে সিরাকোস (Syracuse) এসব 'বোবা নাটক' বা 'মূকাভিনয়' রচনা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে হেরোডাস (Herodas) তাঁর 'বোবা নাটকে' অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশের সূচনা করেন। যা 'থিয়েক্রিটের আলেকজান্দ্রিয়ান' কবিতাকে প্রভাবিত করে। এবং ল্যাটিন কবি প্লটু (Plautus)ও এতে প্রভাবিত হন। টেরেন্স (Terence) হোরাক (Horace) ও অন্যান্য রোমান 'বোবা নাটক' রচয়িতারা 'ডেসিমাস ল্যাবারিয়াসে' (Decimus Laberius) ও 'পাবলিক সিরাসের'(Publices Syrus) মতো খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের আংশিক অনুসরণ করে।

"বোবা নাটক মূলত হাস্যরসাত্মক কিন্তু একটি মিলনাত্মক নাটকের মতো একটি সম্পূর্ণ ঘটনার প্রয়োজন হয় না।" এর গুরুত্ব চরিত্রের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং এর বিকাশলগ্নে এর মূল উপাদানসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ছিলো যা জনসাধারণের মধ্যে ছিলো জনপ্রিয়। এক সময়ে এই 'বোবা নাটকের' চরিত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতো বেশি বৃদ্ধি পায় যে খ্রীষ্টান চার্চ (church) নাটক ও অভিনেতাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং এরই প্রেক্ষিতে ৫ম খ্রীষ্টাব্দে যারা 'বোবা নাটকে অভিনয় করতো' অর্থাৎ মূকাভিনেতাদের প্রতি চার্চ বা পুরোহিতরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা 'বোবা' নাটক বা মূকাভিনয়ে কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে ১৬শত খৃীস্টাব্দে পুনরায় 'বোবা নাটক' বা মূকাভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইটালীর 'কমোডিয়া ডেল আর্ট' (Commedia dellarte) থেকে ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে—তাদের নাট্যশালায় ৩ অঙ্কের 'বোবা নাটক' জনপ্রিয়তার মাঝে (১৯ শতকে) মঞ্চস্থ হয়। কাজেই 'ফ্রান্সকে বোবা নাটক বা মূকাভিনয় ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে।'

বর্তমান বিশ্বে—বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন জায়গায় 'বোবা নাটক বা মূকাভিনয়' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই জনপ্রিয়তা ও প্রসারলাভ প্রধানত এর কলা কৌশলের উপরই নির্ভরশীল। এবং আজকের যে 'বোবা নাটক' বা 'মূকাভিনয়' তা একটি ভিন্ন শিল্প মাধ্যম হিশেবেই বিবেচিত ও জনপ্রিয়তা এবং প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে 'বোবা নাটক বা মূকাভিনয়' সম্পূর্ণ নির্বাক ও শুধু অঙ্গ-ভঙ্গীর ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল। এতে প্রধানত হাত, পা এবং বাহু সঞ্চালনেই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু চোখ, চোখের ভ্রূ ও মুখ অভিব্যক্তি প্রকাশে ক্রিয়াশীল থাকে।

বর্তমানের অত্যাধুনিক বিশ্বে মূকাভিনয় একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেখানে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো সবাক নাটক, নাটকের বক্তব্য বা এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয় প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারেন বা কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন—সেখানে একটি 'বোবা নাটক' সচ্ছন্দে প্রদর্শিত হতে পারে। এবং এই 'মূকাভিনয়ে'র অভিব্যক্তিই নাটকের মূল কাহিনীর বা

বক্তব্যকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুটনে সহায়ক। মূকাভিনয় বা বোবা নাটককে পাণ্ডুলিপি, অনুষ্ঠানসূচী, ঘটনাপ্রবাহও এর সামঞ্জস্যতা—প্রত্যেকটিরই মূকাভিনয়ের মতো গুরুত্ব রয়েছে। মূকাভিনয় অনেকটা কার্টুনের মতো অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। কার্টুনকে তাই মূকাভিনয়ের যমজ ভাই বলা হয়। মূকাভিনয় অতিরঞ্জিত হলেও নাট্যকারকে অবশ্যই মাত্রা ঠিক রেখে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। যাতে নগ্নতা, অশ্লীলতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি প্রাধান্য না পায়, ঠাঁই না পায়।

পার্থপ্রতিম মজুমদার

পার্থ প্রতিম মজুমদার মূকাভিনয়ে একাই একটি প্রতিষ্ঠান

আমি তখন ছোট—স্কুলে পড়ি। বাবা, মা সব এখানে আর আমি কলকাতা। যে বাড়িটাতে থাকতাম তার পাশের বাড়ির একটা লোককে প্রতিরোজ কিছু ছেলে নিয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করতে দেখে অবাক হতাম। আশ্চর্য, লোকটা এমন করে কেন? ছেলেগুলোই বা তাঁর সাথে-সাথে এমন করছে কেন? এই আগ্রহ আমাকে সেই লোকের কাছে নিয়ে গেলো। আমি প্রতিরোজ বসে-বসে নিবিষ্ট মনে এসব দেখি। আগে হাসি পেতো—পরে আর হাসি পায়নি। একদিন একটা অভিব্যক্তি যখন কিছুতেই ছেলেগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারছিলো না তখন আমি সেই লোককে বললাম—কাকা আমি করে দেখাবো? চোখ কুঁচকে কাকা আমায় একটু দেখে নিয়ে বললেন—তুই দেখাবি, দেখাতো।

দেখালাম। মুহূর্তেই কাকা অর্থাৎ সেই লোকটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার ধপ করে নিভে গেলেন মুহূর্তেই। খুব গম্ভীর গলায় বললেন—ভানু এসব তুমি শিখো না কাকা। বড় হয়ে তুমি তোমার অন্যসব কাকাদের মতন বড়-বড় ডাক্তার হয়ো, ইঞ্জিনিয়ার হয়ো। এসব শিখতে গেলে, শিখলে জীবনে খুব কষ্ট পেতে হয়…।

কিন্তু আমার আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হলো না। সেই যে ছেলেবেলা যোগেশ কাকাকে দেখে, যোগেশকাকার মূকাভিনয় দেখে মোহগ্রস্ত হলাম—আমার আর ফেরা হলো না কোনোদিকে। বলছিলেন ভানু—অর্থাৎ আমাদের দেশের, এই বাংলাদেশের অন্যতম একক এবং এ-দেশে মূকাভিনয় শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা—পাইনিয়র মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদার। ভানু ওরফে পার্থ প্রতিম মজুমদারের ভাষায়—যোগেশ কাকা বা সেই লোকটি হচ্ছেন পৃথিবীর পাঁচ-জন সেরা মূকাভিনেতার একজন—শ্রী যোগেশ দত্ত। শ্রী যোগেশ দত্তের কাছে কলকাতার যোগেশ মাইম একাডেমী থেকে পার্থ-এর মূকাভিনয়ে হাতে-খড়ি। তারপর হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আজকের এই অবস্থা ও অবস্থান।

প্রথম-প্রথম লোকজন তো মূকাভিনয়কে ভাঁড়ামো বলেই মনে করতো। রাস্তাঘাটে আমাকে দেখে বলতো—"অই যে, হালায় চার্লি।" এখন সে অবস্থা আর নেই। মূকাভিনয় যে একটি শিল্প মাধ্যম এবং আলাদা শিল্প মাধ্যম এ-বোধ এ-দেশের মানুষের হয়েছে—এটুকু আমার জন্যে অনেক পাওয়া। যে মূকাভিনয়কে এ-দেশের মানুষ চিনতো না, জানতো না—সে মূকাভিনয় দেখার জন্যে মানুষ এখন লাইন দেয়। টিকিট কেটে মানুষ এখন মূকাভিনয় দেখছে।

"পার্থ প্রতিম মজুমদার নিজে একাই একটি প্রতিষ্ঠান। যেখানে কোনো স্কুল নেই, শিক্ষক নেই এ-শিল্পের, সেখানে পার্থ-এর জীবনের সবচে' বড় চ্যালেঞ্জ এ-শিল্পের সাধনা।

যেখানে কোনো মেকাপ, স্টেজ এমন কি কাপড়টি পর্যন্ত (মূকাভিনয়ের আনুষঙ্গিক জিনিশপত্র) নেই, সেখানে এই 'সাব কনটিনেন্টে বিক্ষিপ্তভাবে পার্থ প্রতিম মজুমদারের এই যে নিরলস সাধনা তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কষ্টকর এবং প্রশংসনীয় তো বটেই।" কোনো একটি পত্রিকায় পার্থ প্রতিম মজুমদার সম্পর্কে এসব কথাবার্তা বলেছেন একজন বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি 'আলি অাঁস ফ্রাঁসেজ-এর ডিরেক্টর মিঃ জ্যারার্ড গ্রুসার্স। মিঃ জ্যারার্ড গ্রুসার্সের কথাগুলো কতোখানি বাস্তব সত্যি তা পার্থ প্রতিম মজুমদারকে যাঁরা কাছে থেকে চেনেন, জানেন—জানেন পার্থপ্রতিম মজুমদারের সাধনার কথা তাঁরা নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করতে পারবেন। পার্থ প্রতিম মজুমদারের দাদার বাড়ি ফরিদপুরের পাংশা, বাগদুলি গ্রামে। জন্ম পাবনা শহরের কালা চাঁদ পাড়ায় এবং সেখানেই সেটেল্ড। ব্যক্তিগত জীবনে পার্থ প্রতিম মজুমদার একজন টগবগে তরুণ, প্রাণোচ্ছল যুবক। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব তাঁর। পার্থ-প্রতিম মজুমদারের ভাষায় 'আত্মীয়-স্বজনের চে' বন্ধু-বান্ধবের স্থান আমার কাছে অনেক ওপরে। বন্ধু-বান্ধব ভুল বুঝলে আমার সবচে খারাপ লাগে। আমার বন্ধু-বান্ধবের কোনো ক্ষতি হোক এ আমি কখনোই চাই না।'

পার্থ প্রতিম মজুমদার অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। সারাদিন পরিশ্রমের পর 'মূকাভিনয়' অনুশীলনে তাঁর অনুশীলন চলে নিয়মিত। বললেন—সারাদিন পরিশ্রমের পর ২/৩ ঘণ্টা মূকাভিনয়ের ওপর শারীরিক কসরত করতে হয় এবং এরপরও পার্থ প্রতিম মজুমদার ইন্টারমেডিয়েট পাস করেছেন ভারত থেকে বিজ্ঞান নিয়ে। এরপর পড়াশোনা করেছেন 'ঢাকা মিউজিক কলেজে'। মূকাভিনয়ের আগে পার্থ নিয়মিত গান গাইতেন। এবং সঙ্গীত সাধনা তাঁর এখনো চলছে নিয়মিত। যে কোনো কিছুর সাফল্যই, বিশেষ করে আমার মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান তা ছোট বড় যাই হোক না কেন—আমার সবচে বড় আনন্দ। আর আমার ট্র্যাজেডী—কোনো কাজ একবারে হয়নি। বলছিলেন পার্থ। 'ড্রামা সার্কেল' এই গ্রুপ থিয়েটারের সদস্য পার্থ প্রতিম মজুমদার তাঁর নিজের মূকাভিনয়ের জন্যে লাইট ও মিউজিক নির্দেশনা নিজে একাই করেন। এরপর আছে তাঁর বিজনেস। পার্থের ভাষায়—মূকাভিনয়কে বাঁচিয়ে রাখা তথা এ-শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করার মানসেই আমার বিজনেস।

পার্থ প্রতিম মজুমদারের অসংখ্য ফ্যান বা ভক্ত আছে। এঁদের কথা বলতে গিয়ে বললেন—মূক ও বধির স্কুলে 'শো' করতে গিয়ে ওখানকার ছেলে-মেয়েদের যে উচ্ছ্বাস—সবাই আমাকে একটু ছুঁয়ে ছবি তুলবে। এবং একটি ছোট্ট মেয়ে, যে ভালো করে কথাই বলতে শেখেনি—আমাকে দেখে 'পাত থ পত্তিম প্রতিম মজুমদাল' বলে তার যে উচ্ছ্বাস—বিশেষ করে এ-দুটো ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দেয়।

এ-পর্যন্ত মূকাভিনয়ে যতোগুলো স্কেচ-এর অভিনয় করেছেন তার মধ্যে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যে স্কেচ' এবং 'জন্ম থেকে মৃত্যু' এ দুটো স্কেচ ব্যক্তিগতভাবে পার্থ প্রতিম মজুদারের ভালো লেগেছে; মন ছুঁয়ে যায়। মূকাভিনয়ের এ-স্কেচ সম্পর্কে পার্থ প্রতিম বললেন—একটি স্কেচ তৈরি করতে ৩ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। পার্থ-জানালেন যে, তাঁর এ-শিল্প সাধনার ৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগস্ট মাসের দিকে একটি বেশ বড় ধরনের অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি চলছে, ইচ্ছে আছে।

মূকাভিনয় চলচ্চিত্রায়ণে কতোখানি সাফল্য আসতে পারে বা মূকাভিনয়কে কি চলচ্চিত্রায়ণ করা যায় না? এ প্রশ্নে পার্থ বলেন—আমাকে নিয়ে মূকাভিনয়ের ওপর আলমগীর কবির একটি শর্টফিল্ম তৈরি করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় চলচ্চিত্রায়ণের জন্যে এখনো সে সময় আসেনি। একটি 'মাইম একাডেমী' বা মূকাভিনয় একাডেমী করার ভবিষ্যৎ ইচ্ছে পোষণ করেন পার্থ প্রতিম মজুমদার। বললেন আরো প্রশিক্ষণের পর শিশুদের জন্যে একটা একাডেমী করার ইচ্ছে রাখি।

সবশেষে পার্থ প্রতিম মজুমদারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম—আপনি কি মনে করেন যে মূকাভিনয় সমাজের কোনো উপকার করতে পারে, সমাজের কি কোনো উপকারে আসে মূকাভিনয়? একটু হেসে জবাব দিলেন পার্থ—'সমাজের উপকার, সে-তো অনেক বড় ব্যাপার—মূকাভিনয়ে যে মানুষের অন্তত একটা 'সেন্স' হচ্ছে এটাই আমার কাছে অনেক পাওয়া, অনেক বড় সাফল্য।

শেষ কথা

"...যখন তুমি একা থাকো তোমার আত্মা বেরিয়ে যায় মন থেকে এবং হাজার রকমের ভঙ্গী তৈরি করে যা' সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু যে শিল্পী তার দু'টি চোখ একটা ভঙ্গীকে ধরে রাখে—সেটাই শিল্প...।"

শিল্পের এ-সাধনায় বাংলাদেশে নবীন এই 'মূকাভিনয় শিল্প' সুপ্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের দেশে এ-আমাদের সকলের চাওয়া। আমাদের সকলের চাওয়া—পার্থ প্রতিম মজুমদার আপনার নিরলস এই কষ্ট কঠোর সাধনায় আপনি এগিয়ে চলুন সামনের দিকে, আমাদের বন্ধুত্বের হাত আমরা বাড়িয়ে রেখেছি—এগিয়ে চলুন আপনি. সফলতা আপনার অনিবার্য, সফলতা আপনার আসবেই......।

অপর সভ্যতা

বিল আর জিল

বিল আর জিল। নামে মিল থাকলেও দু'জন স্বামী-স্ত্রী। আমেরিকার কানেকটিকাটে প্রতি দু'মাস অন্তর বেষ্ট কাপ্‌ল্‌কে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার কোনো অর্থ নয়। যে কাপ্‌ল্ নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সবচেয়ে মধুর এবং সবচেয়ে আন্তরিক প্রমাণ করতে পারে, তারা পনেরো দিনের জন্যে হাওয়াই দ্বীপে হানিমুনে যাবার সুযোগ পায়। বিল আর জিল বিয়ে করেছে দেড় বছর। এর মধ্যে তারা নয়বার গেছে মিয়ামী, ক্যালিফোনিয়া, ফিলাডেলফিয়া, কানাডার টরোন্টো, হাওয়াই, আলস্কা এবং অষ্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যাসলে। এই সময়ের মধ্যে তারা না-কি একদিনও পরস্পরের সাথে ঝগড়া করেনি। বিলের বয়স ৩৪ বছর এবং জিলের ৩৩। গত মাসে তারা বেষ্ট কাপ্‌ল্ নির্বাচিত হয়েছে।

বিটল্‌সে বিয়ে সমস্যা

সম্প্রতি রিংগো ষ্টার, নতুন একটি গান গেয়েছেন। গানটির প্রথম লাইন 'ব্যাকুপ্‌স্ ব্লুস'। এই গান শুনে বিটল্‌স্-এর নামকরা গায়ক রিংগোর প্রেমে পড়ে বারবারা ব্যাচ। বিট্‌ল্-এ সাধারণত কারো সাথে কারো প্রেম করার নিয়ম নেই। পে্মের মতো কোনো ঘটনার খবর পেলেই তারা বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু রিংগো আর বারবারার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তারা নিশ্চিন্তে প্রেম করে যাচ্ছে। লেননের মৃত্যুর পর বিটলস্-এর যে পরিবর্তন এটা তার অন্যতম, বারবারা নিউইয়র্ক সিটির একজন পুলিশম্যানের মেয়ে। বয়স ৩৩। আর রিংগোর বয়স ৪০।

বাড়ির দাম

ঢাকার বাড়িওয়ালাদের সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কিন্তু আমেরিকায় একটি বাড়ির দাম ক্যামন হতে পারে? গ্রামাঞ্চলে কাঠের একটি তিনতলা বাড়ি। টিনের চাল। কাজে জাতীয় এই বাড়ির দাম ২,৪৯,৫০০ ডলার। ইটের দেয়াল কিন্তু টালির ছাদওয়ালা একটি নিরিবিলি বাড়ির দাম হাউষ্টনে ৩,৮০,০০০ ডলার। খুব সাধারণ একটি কাঠের দু'তলা বাড়ির দাম ৬৫,৯৯০ ডলার। এগুলো সবই গ্রামাঞ্চলের বাড়ির দাম। তাহলে শহরে ক্যামন দাম হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

পারিবারিক বাস্কেট টীম

ক্লিনের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১ জন। ক্লিন, ক্লিনের বউ, তাদের চার ছেলেমেয়ে, দু'জন শ্যালক আর ক্লিনের দু'ভাই ও একবোন। এই নিয়ে তারা তৈরি করলো একটা বাস্কেটবল টীম। অষ্ট্রেলিয়ার এই পারিবারিক বাস্কেটবল টীম প্রতিদিনই বাড়ির লনে খেলা প্রাক্‌টিস করে। আজ পর্যন্ত ক্লিনের টীম পার্থে ১৭টি আর এ্যাডলেডে ২টি, সিডনিতে ১টি, মেলবোর্ণে চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এবং প্রতিবারই বিজয়ী হয়েছে।

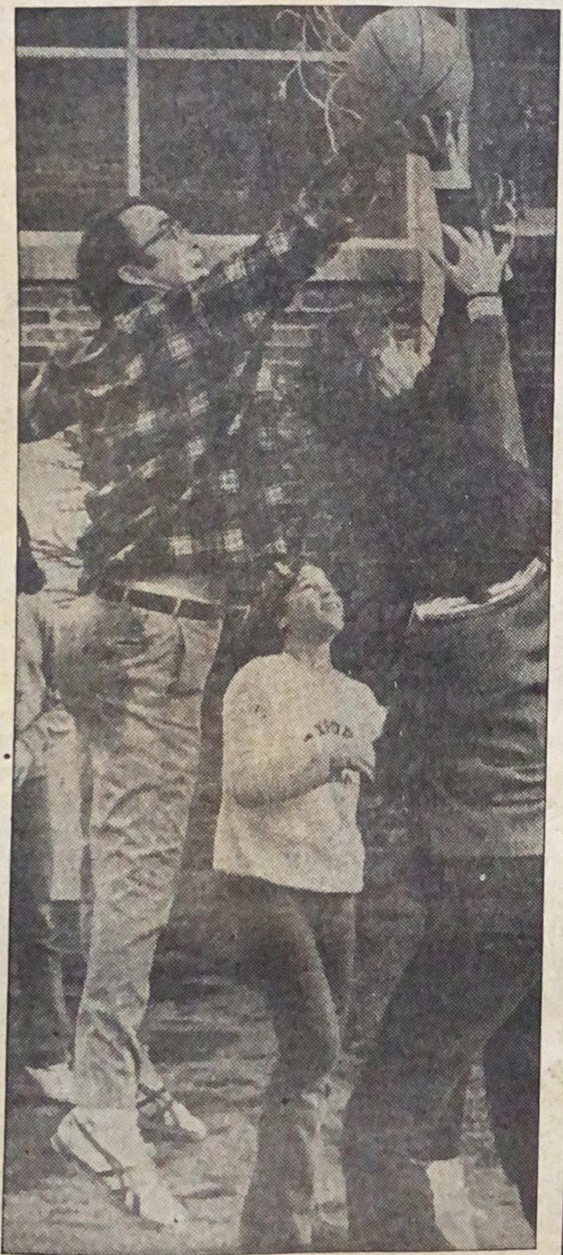

বামুন প্রেমিক

সবাই ভেবেছিলো সুসান এ্যান্টন আর ডাডলি মূরের প্রেম বুঝি শুধুই স্টান্টবাজী। অবশ্য এর পেছনে কারণও ছিলো বিস্তর। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো সুসান মেয়ে হলেও তার উচ্চতা পাঁচফুট এগারো ইঞ্চি। আর মূরের উচ্চতা মাত্র পাঁচফুট দু' ইঞ্চি। অর্থাৎ ন' ইঞ্চি কম। আর এদিকে সুসানের বয়স উনত্রিশ এবং মূরের পঁয়তাল্লিশ। তবু তারা এক সাথেই গান গায়, পার্কে যায়, স্ন্যাকে, বারে বসে, গাড়ি ড্রাইভ করে এবং একসাথে রাতও কাটায়। তবে বুড়ো বামুন প্রেমিককে সুসান বিয়ে করবে কি-না তারা নিশ্চয়তা দেয়নি।

চীনে জগিং

পশ্চিমা দেশগুলো যখন জগিং করতে শুরু করলো, তখন সেই ঢেউ চীনেও এসে পৌঁছায়। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী চি চেং বলছিলো, আমি যখন পিকিং-এর রাস্তায় জগিং শুরু করি, তখন অনেকেই ভাবতো আমি বুঝি পাগল। এখন শুধু পিকিং-এর রাস্তাতেই নয়, সাংহাই, হংকং, ম্যানিলা, ব্যাংকক প্রভৃতি শহরে জগিং শুরু হয়েছে। জগিং ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্করাও দৌড়ায়।

অর্জুন মল্লিক

প্রিয়দর্শিনী

মিসেস স্বপ্না আহমেদ/সিলেট।

আপনার সমস্যাটা পুরোপুরি মানসিক। এসব বাজে চিন্তা না করে নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। শরীরের একটিমাত্র অঙ্গের ত্রুটির জন্য আপনি অসুন্দরী হয়ে গেছেন এমন ভাবছেন কেন?

সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়। যাহোক নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য মনকে প্রফুল্ল রাখবেন। নিয়মিত শরীরের যত্ন নেবেন। দেখবেন আবার সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।

রীনা/যশোর।

আমার শরীরের মাপ ৩২—২৫—৩২, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, আমার গঠন হালকা-পাতলা, আমি একটু মোটা হতে চাই।

উত্তর: আপনার ফিগার উচ্চতা অনুযায়ী চমৎকার। ওজন জানাননি। যাহোক খাবার যা খাচ্ছেন তা ঠিকমতো হজম হলে শরীরে লাগছে কিনা সেটা পরীক্ষা করুন।

পুষ্টিকর খাবার খাবেন, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং পরিশ্রম করলে একটু মোটা অনায়াসে হতে পারবেন।

দ্বিতীয় সমস্যার জন্য বলছি ব্রা সবসময় ব্যবহার করবেন না তাহলেই সমাধান পাবেন।

মিস্‌ লীনা/বনানী/ঢাকা।

আমার চুলগুলো অত্যন্ত ঘন এবং মোটা। সবসময় কেমন যেন আঠা-আঠা ভাব। কি করে চুল ঝরঝরে এবং চিকন করতে পারি।

দ্বিতীয়ত আমার মুখে বেশ কালো-কালো দাগ হয়েছে। আমর একটা ব্রণ হয়েছিলো ওটা পেকে গলে যায়নি। আস্তে-আস্তে চামড়ার ভেতর ডেবে গেছে ঠিকই কিন্তু চামড়ার ভেতর শক্ত দানার মতো হয়ে আছে। উপায় বলে দিন।

উত্তর: চুলে একদম তেল দেবেন না। কারণ মাথায় খুস্‌কি থাকলে তেল দিলে চুল আঠা হয় বেশি। এছাড়া যদি তেল ব্যবহার করেন তবে সপ্তাহে মাত্র ১ দিন এবং আধ-ঘণ্টা পরের শ্যাম্পু করে তেল মাথা থেকে ধুয়ে ফেলবেন। যথাসম্ভব চুল খুব পরিষ্কার রাখবেন। ভেজা চুল রাখবেন না। চুল শুকিয়ে গেলে পানিতে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করবেন। এতে চুল চিক্‌চিক করবে। ভেজা চুল কখনও বাঁধবেন না। পানি এবং ভেজা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ চুল থাকলে চুল শক্ত হয়ে যায়। অপরিষ্কার ভেজা চুল বেঁধে রাখলে আঠা হবেই।

উত্তর দিচ্ছেন: চৌধুরী রীনা নাসির। এ-বিভাগে রূপ ও শরীর চর্চা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়া হবে। কেবলমাত্র মহিলারা একটি কি বড় জোর দু'টি প্রশ্ন করতে পারবেন। প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা: প্রিয়দর্শিনী, প্রযত্নে—রোববার, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় সমস্যার জন্য একটি ডেকচিতে করে পানি ফুটিয়ে নেবেন। উনন থেকে ফুটানো পানি নামিয়ে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে মুখটা আস্তে-আস্তে ডেকচির কাছে নিয়ে ঐ ফুটন্ত পানির ভাপ মুখে যেখানে ব্রণ আছে সেখানে লাগাবেন। ২ মিনিট এ-রকম ভাপ নেবার পর দেখবেন, লোমকূপের গোড়াগুলো ভালোমতো খুলে গেছে। এবার টিস্যু পেপার নিয়ে আস্তে-আস্তে চেপে ব্রণের শাঁস বের করে ফেলবেন।

শাঁস বের করার পর ডিমের শাদা অংশে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে ফেটে নেবেন এবং চোখের চারপাশ বাদ দিয়ে ঐ লেবুর রস মিশ্রিত ডিম মুখে মেখে চোখ বন্ধ করে ১৫ মিনিট শুয়ে থাকবেন। এরপর মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন। আস্তে-আস্তে দাগ চলে যাবে। ইচ্ছা করলে সপ্তাহে ১ দিন নিয়মিত ডিম এবং লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন।

জেসমিন আক্তার/চট্টগ্রাম।

আমার দু'চোখ থেকে সবসময় ময়লা বের হয়। কি করলে চোখ থেকে ময়লা দূর করা যায়।

উত্তর: ছোট শিশুদের জন্মের সময় অনেকক্ষেত্রে নাকের কাছের একটি নার্ভ ঠিকমতো না খোলায় এই সমস্যা সাময়িকভাবে দেখা দেয়। শিশু বড় হলে আবার ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আপনার এই বয়সে কেন হচ্ছে বুঝলাম না। তবু ডাক্তার দেখাবেন। এ-ছাড়া পানি অল্প গরম করে তুলো ভিজিয়ে চোখের নাকের দিকের কোণায় টিপেটিপে ময়লা পরিষ্কার করবেন দিনে ৬/৭ বার।

তানী/সিলেট।

তোমার বন্ধুর ঠিকানা যোগাড় করে অনুতপ্ত হয়ে মনের কথা জানিয়ে চিঠি লিখ। শান্তি পাবে। কেমন?

স্বস্তি চৌধুরী/পানাইল।

আমার শারীরিক কোনো অসুস্থতা নেই তবুও চুল পড়ে যাচ্ছে। নারিকেল তেল ব্যবহার করি। মাঝে-মাঝে লেবুর রস দিয়ে মাথা পরিষ্কার করি। আমি বাজারের তৈরি ক্রিম ব্যবহার করি না। ঘরে তোলা টাটকা মাখন ব্যবহার করি…এতে ত্বকের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর: কিছু-কিছু চুল প্রতিদিন পড়লেই ওটা স্বাভাবিক শুধু লক্ষ্য রাখবেন নতুন চুল উঠছে কিনা। তেল সপ্তাহে ১ দিন দেবেন। এবং নিয়মিত চুলে ভালো শ্যাম্পু অথবা মশুর ডাল বাটা এবং লেবুর রস মিশিয়ে চুল পরিষ্কার রাখবেন। ভেজা অবস্থায় চুল বাঁধবেন না। মোটকথা চুলের পরিচর্যা করলে বেশি চুল পড়বে না। দ্বিতীয়ত ত্বক যদি তৈলাক্ত না হয় তবে প্রতিদিন রাতে মাখন ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে না বরং খুব উপকার হবে।

চৌধুরী রীনা নাসির

মোহামেডান স্পোর্টিং

লীগ শিরোপা কে পাবে?

কিছুদিন আগে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলা শুরু হলেও তা এগিয়েছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন বেশ কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ খেলা পরিচালনার কারণেও অপমৃত্যু ঘটেছে আবাহনী ও ওয়ারীর খেলাটি। এমনিভাবে ছেদ পড়তে-পড়তে অনিশ্চিত ভাবে এগুচ্ছে ফুটবল লীগ। মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বর্তমানে খেলা একদম বন্ধ রয়েছে।

পর-পর দু'বার তারিখ পরিবর্তনের পর একাশির ফুটবল লীগ বেশ দেরিতেই শুরু হয়। যার জন্য ক্রীড়ামোদীদের আশা ছিলো কর্তৃপক্ষ সিঙ্গেল লীগের মাধ্যমে খেলা শেষ করবে। কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের (ডামফা) কর্মকর্তারা এবারও ব্যবস্থা করেছেন সুপার লীগের। যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলবে ফুটবল লীগ। ডামফা'র ঘোষণা অনুযায়ী আগষ্টে লীগ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু যেভাবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে তাতে এবারের লীগ সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরেও শেষ হবে কি-না সন্দেহ। কাজেই ডামফা'র উচিত রিটার্ণ লীগের পরিবর্তে অবিলম্বে সিঙ্গেল লীগের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ক্লাবের কোচদের সাথে আলাচনা করে দেখা গেছে প্রায় সবাই দীর্ঘদিনব্যাপী লীগ চালানোর পরিবর্তে সিঙ্গেল লীগের ব্যাপারেই উৎসাহী। কিন্তু সিঙ্গেল লীগের ব্যবস্থা করতে ডামফা'র 'বিজ্ঞ' কর্মকর্তারা কেন যে নারাজ তা মোটেও বোঝা যাচ্ছে না। যা হোক, লীগ শেষ হওয়ার পর-পরই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব টুর্ণামেন্ট আগা খান গোল্ড কাপের খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এমনিতেই গতবার আগাথান গোল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই একটি ঐতিহ্যবাহী টুর্ণামেন্টের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ডামফা লীগের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ করতে উদ্যোগী হবেন বলে ক্রীড়ামোদীরা আশা করছেন।

এ-পর্যন্ত লীগের মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাগুলো

দেখে এখনও বিভিন্ন দলের শক্তিমত্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ কোনো দলই এখন পর্যন্ত চমক লাগানোর মতো কিছু দেখাতে পারেনি যা ক্রীড়ামোদীদের মনে স্থায়ী আসন রাখতে পারে। তবে এটুকু অনুমান করা যায় যে, লীগ শিরোপা লাভের লড়াই মোটামুটিভাবে তিনটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর এ-তিনটি দল হচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল মোহামেডান স্পোর্টিং,রানার্স আপ বিজেএম সি ও আবাহনী ক্রীড়চক্র। উপরোক্ত তিনটি দলই এ-পর্যন্ত দু'-তিনটি করে খেলায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে মোহামেডান তিনটি খেলায় অংশ নিয়ে সবগুলোতে দেখেছে জয়ের মুখ। অবশ্য সবগুলো জয়ই এসেছে একটি মাত্র গোলের ব্যবধানে। যার ফলে দলের হাজারো সমর্থকের মনে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ফিরে আসেনি। চলতি মৌসুমে দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়ে মোহামেডান ফেডারেশন কাপ ঘরে তুলেছে। কাপ জয়ের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস বুকে নিয়ে মাঠে নেমেও মোহামেডানের পরিশ্রমী খেলোয়াড়রা প্রত্যাশিত ফল এখনও পাননি। যার জন্য না খেলোয়াড়, না সমর্থক কারো মনে স্বস্তি নেই। লীগে মোহামেডান এ-পর্যন্ত জয়ী হয়েছে ফরাশগঞ্জ, দিলকুশা ও পুলিশের বিরুদ্ধে। সবগুলো খেলাতেই মোহামেডানের সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও মাত্র এক গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়। এ-জয় দেখে মোহামেডানের শক্তিমত্তা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই। কারণ মোহামেডানের কাছে পরাজিত তিনটি দলই একদম নিম্নসারির। তবে মোহামেডানের খেলোয়াড়দের প্রচণ্ড পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ভবিষ্যতে ভালো ফলাফল করার কিছুটা ইঙ্গিতই বহন করে। যাহোক মোহামেডানের রক্ষণভাগ অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং যে কোনো দলের তুলনায় শ্রেষ্ঠই বলা যায়। মধ্যমাঠ ও ফরোয়ার্ড লাইন যে তেমন সুগঠিত নয় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তবে রক্ষণভাগের অনুপ্রেরণা এবং সেই সাথে ষ্ট্যামিনা ও স্পীড মধ্যমাঠ এবং ফরোয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড়দের মনে যদি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে তবে মোহামেডানের লীগ শিরোপা লাভ তেমন দুঃসাধ্য হবে না।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন

নামী-দামী অর্থাৎ লাখ, দেড়লাখী খেলোয়াড় দলে নিয়েও বিজেএমসি সুবিধা করতে পারছে না। দেদার টাকা ছড়িয়ে টীম করার পরও ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে যে ভাবে তারা আবাহনীর কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে তা বিজেএমসি'র জন্য লজ্জাজনক স্মৃতি হিশেবেই থাকবে। টাকা ছড়িয়ে খেলোয়াড় দলে নেয়া যায় ঠিকই কিন্তু সেই সাথে খেলোয়াড়দের যদি দলের জন্য সত্যিকার দরদ না থাকে তবে সে দল যে কোনোদিনই চমক লাগানো খেলা উপহার দিতে পারে না তার প্রমাণ বিজেএমসি। বিজেএমসি তিনটি খেলায় অংশ নিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করেছে। তবে খেলাগুলোয় জয়ী হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে বিজেএমসি'কে। নিম্নমানের দলগুলোর সাথে খেলতে গিয়েই যদি বিজেএমসি'কে হিমশিম খেতে হয় তবে তারা ভবিষ্যতে যে কি করবে তা ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিরাট প্রশ্ন। তবে এটা ঠিক বিজেএমসি এখনও পুরো দল নিয়ে মাঠে নামতে পারেনি। পুরো দল নিয়ে মাঠে নামতে পারলে বিজেএমসি একটি দুর্বার দলে রূপ নেবে বলেই সমর্থকরা আশায় বুক বেঁধে আছেন। সমর্থকদের এ-আশা কবে পূরণ হবে তা কেবল বিজেএমসির নামী-দামী খেলোয়াড়রাই বলতে পারেন।

আবাহনী এ-পর্যন্ত জয়ী হয়েছে একটি মাত্র খেলায়। আর এ-খেলাটি ছিলো ইষ্ট এণ্ডের বিরুদ্ধে। ওয়ারীর বিরুদ্ধে আবাহনীর দ্বিতীয় খেলাটি রেফারী আবদুল মোমিনের চরম ব্যর্থতায় পণ্ড হয়ে যায়। ফেডারেশন কাপ এবং লীগের দু'টি খেলা দেখে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আবাহনীর সবচেয়ে দুর্বল স্থান হচ্ছে রক্ষণভাগ। মধ্যমাঠ এবং আক্রমণভাগ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রক্ষণভাগের আস্থাহীন খেলা আবাহনীকে যে কোনো সময় চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। কাজেই রক্ষণভাগের উপরই নির্ভর করছে আবাহনীর ভবিষ্যৎ।

মৌসুমের শুরুতে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও রহমতগঞ্জকে লীগ শিরোপার লড়াইয়ে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে গণ্য করা হলেও তারা আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে পড়ছে বলেই ক্রীড়ামোদীদের ধারণা। দু'দলেই বেশ কয়েকজন করে 'নামী-দামী' খেলোয়াড় রয়েছেন।

কিন্তু তারা নামের প্রতাপ মাঠে দেখাতে পারছেন না। যার জন্য লীগের প্রথম খেলাতেই ব্রাদার্স এবং রহমতগঞ্জকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মাঠ ত্যাগ করতে হয়। ব্রাদার্স প্রথম খেলায় ২—১ গোলে নবাগত ফরাশগঞ্জের কাছে এবং রহমতগঞ্জ ২—০ গোলে ওয়াণ্ডারার্সের কাছে হেরে যায়। দ্বিতীয় খেলায় রহমতগঞ্জ অবশ্য জয়ের মুখ দেখেছে। ব্রাদার্স প্রথম খেলায় হেরে যাওয়ার পর এখনও কোনো খেলায় অংশ নেয়নি। অন্য দলগুলোর মধ্যে ওয়াণ্ডারার্স, সাধারণ বীমা, ওয়াপদা, ফরাশগঞ্জ প্রভৃতি দলে তেমন নামী-দামী খেলোয়াড় না থাকলেও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের সমাবেশ ঘটেছে, যারা দলীয় সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন বলেই মনে হয়। এই দলগুলো ইতিমধ্যে দু-একটি খেলায় অংশ নিয়ে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে। কাজেই নামী-দামী দলগুলোকে সাধারণ বীমা, ওয়াণ্ডারার্স, ওয়াপদা ফরাশগঞ্জ প্রভৃতি দলগুলোর বিরুদ্ধে জয়ী হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে মোহামেডানের ম্যানেজার মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন, আবাহনীর কোচ আবদুর রহিম, বিজেএম সি'র প্রবীণ খেলোয়াড় মোহাম্মদ শফিক উজ-জামান, ব্রাদার্স ইউনিয়নের কোচ গফুর বালুচ, রহমতগঞ্জের কোচ ওয়াজেদ গাজী ও সাধারণ বীমার কোচ মোহাম্মদ নাজির নিজ-নিজ দল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন।

মোহামেডান দর্শকদের মনমাতানো খেলা উপহার দেবে

মেজর (অবঃ) হাফিজ

মেজর (অবঃ) হাফিজ

যেহেতু কয়েকটি অফিস টীম খোলায়াড়দেরকে অধিক 'সুযোগ সুবিধা' দিয়ে থাকে, সেহেতু আমাদের মতো প্রাইভেট ক্লাবের পক্ষে শক্তিশালী দল গড়া ক্রমেই কষ্টকর হয়ে পড়ছে। এবার আমাদের দল মোটামুটিভাবে গতবারের মতোই শক্তিশালী।

ঢাকা লীগে কোনো দলের জয় পরাজয় নামী-দামী খেলোয়াড় সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। খেলোয়াড়দের বেসিক স্কিল অবশ্যই থাকতে হবে, তবে কঠিন অনুশীলন, পারস্পরিক সমঝোতা এবং টীম স্পিরিটই লীগ বিজয়ের চাবিকাঠি। আমাদের গত বছরে নিয়মিত টীম থেকে গোলরক্ষক পিন্টু এবং ব্যাক বাদল দলত্যাগ করেছে বি,জে, এম, সি'র অনুকূলে। এদের শূন্যস্থান অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে পূরণ করেছে মোশারফ বাদল এবং নবাগত ষ্টপার ব্যাক টিপু। এরা দু'জনেই বয়সে তরুণ এবং নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়, মোশারফ এ-দেশের সেরা চারজন গোলকীপারের মধ্যে স্থান লাভে সক্ষম অনায়াসে। এছাড়াও যারা এ-বছর দলে যোগ দিয়েছেন তারা হলেন গোলরক্ষক হুদা ও লিঙ্কম্যান ফারুক। শক্তিশালী রক্ষণভাগ আমাদের দলের প্রধান সম্পদ। ইউসুফ, আবুল, স্বপন, বেলাল ও মজিদের গড়া রক্ষণব্যূহ যে কোনো দলের আক্রমণভাগকে অকেজো করে দিতে সক্ষম। মধ্যমাঠ আমাদের দুর্বলতম স্থান। তরুণ কামাল অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল, তার পাসিং নির্ভুল হলে সে একজন উন্নতমানের খেলোয়াড়ে পরিণত হবে। ষ্ট্যামিনার ঘাটতি পূরণ হলে রামা এখনও দর্শকদের মন ভরিয়ে তুলতে সক্ষম। এ-ছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ভানু, চমৎকার 'টিমম্যান'। আক্রমণভাগে উইঙ্গার গফফার ও কোহিনূরের খেলায় স্কিলের অভাব রয়েছে তবে পরিশ্রম করে তারা সে ঘাটতি পুষিয়ে দেয়। অধিনায়ক বাদলের শারীরিক সুস্থতার উপর আক্রমণভাগের ধার অনেকটা নির্ভর করে। ষ্ট্রাইকার সালাম ও মোসাব্বের গতবারের মতো গোলমুখে দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হলে মোহামেডান উন্নত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। আক্রমণভাগে অভিজ্ঞ মালা এবং পরিশ্রমী দিলীপ দলের প্রয়োজনে যে কোনো পজিশনে বুদ্ধিদীপ্ত খেলা উপহার দিতে সক্ষম।

এ-বছর মৌসুমের শুরুতে উদীয়মান এবং প্রতিশ্রুতি-

রহমতগঞ্জ

শীলদেরকে নিয়ে খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা প্রশিক্ষক টিপুর অধীনে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করি। এখান থেকে আমরা গোলরক্ষক নূরুল ইসলাম, লিঙ্কম্যান ধলু এবং উইঙ্গার জসীমকে দলভুক্ত করেছি, এদের ভবিষ্যৎ উজ্জল।

আশাকরি মোহামেডান লীগে দর্শকদের মনমাতানো খেলা উপহার দিতে সক্ষম হবে, ইতিমধ্যেই তারা কৃতিত্বের সাথে ফেডারেশন কাপ জিতে নিয়েছে। মোহামেডান ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড় সংগ্রহ এবং দল পরিচালনার ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খেলায় জয়-পরাজয়ের স্থান গৌণ, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মাঠে একটি সুশৃঙ্খল দল নামানো, যে দলের খেলোয়াড়েরা খেলা শিখতে ইচ্ছুক এবং ক্লাবের জন্য দেহমন উজাড় করে খেলবে। বিনীত এবং ভদ্র খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে ক্লাবকে একটি সুখী পরিবার রূপে গড়ে তোলাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। দলের দক্ষ প্রশিক্ষক টিপু এবং কায়কোবাদের নিরলস প্রচেষ্টায় খেলোয়াড়েরা নিয়মিত অনুশীলন করে যাচ্ছেন, লীগের ফলাফল নির্ভর করে মূলত তাদের নিষ্ঠার ওপর।

আবাহনী লীগে কি ফলাফল করবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না

আবদুর রহিম

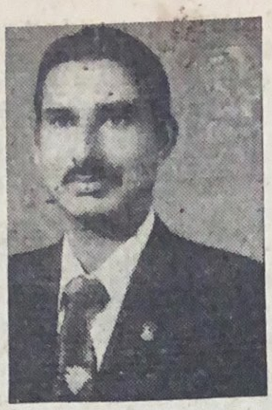

আবদুর রহিম

আবাহনীর খেলোয়াড় সংগ্রহ এবার অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় মন্দ নয়। ক্লাবের কর্মকর্তারা একটি ব্যালেন্স দল গড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টায় তারা সফলও হয়েছেন বলা যায়। যাহোক, খেলোয়াড়দের পজিশন অনুযায়ী সংক্ষেপে কিছু বলছিঃ এবার গোলকীপার মঈনের পরিপরিবর্তে নেয়া হয়েছে সুহাসকে। গতবার মঈনের পারফরমেন্স ভালো ছিলো না, কিন্তু সুহাস বিজে,এম,সি'তে খেলেছে দক্ষতার সাথে। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, গত ক'বছরে আমাদের দেশে তেমন দক্ষ গোল কীপারের আবির্ভাব ঘটেনি। দেশে রিকগনাইসড রাইট ব্যাকের স্বল্পতার দরুন বিদেশ থেকে আনা হয়েছে অশোককে। সে নিজের পজিশনে ভালোই খেলছে। অশোক ছাড়াও রাইট ব্যাক পজিশনে খেলার জন্য রয়েছে জাতীয় যুব দলের মঞ্জু ও আপ কামিং সাইফ। ইনসাইড ব্যাক পজিশনে পাকির আলী ও মনিকে নেয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পাকির আলীর খেলা ইতিমধ্যে দলীয় সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। দলের লেফটব্যাক রকিব শেষ মুহূর্তে দল ত্যাগ করায় ব্রাদার্সের নাসরুকে নেয়া হয়েছে। নাসরু নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। আবাহনীর সমগ্র ডিপ ডিফেন্স সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বলা যায়, দলের উইং ব্যাকদ্বয় নামী দামী না হলেও তারা লীগে ভালোই খেলবে। দেশে সেরা মধ্যমাঠের যে ক'জন খেলোয়াড় রয়েছেন তারা প্রায় সবাই আবাহনীতে অন্তর্ভুক্ত। অমলেশ, বাবুল ও বাবু ছাড়াও এবার নেয়া হয়েছে আশীষ ও ছোট স্বপনকে। কাজেই আবাহনীর এ-পজিশন যে শক্তিশালী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইনসাইড ফরোয়ার্ডের সালাউদ্দীন ছাড়া উদীয়মান জাকির এবং শ্রীলঙ্কার জহির রয়েছেন। এ-ছাড়া উইঙ্গার হিশেবে আনোয়ার ও চুন্নু থাকায় নতুন কাউকে দলভুক্ত করতে হয়নি, কিংবা দলভুক্ত করার প্রশ্নও ওঠে না।

বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে ন্যাশনাল এনগেজমেন্টের দরুন আমরা দলীয় সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য কোনো প্রিপারেশন পিরিয়ডে পাইনি। কিন্তু বিশ্বের সবদেশেই লীগ শুরুর আগে 'রেষ্ট পিরিয়ড' এবং 'প্রিপারেশন পিরিরডর' ব্যবস্থা থাকে। নতুন ও পুরোনো খেলোয়াড়ের সমাবেশ ঘটায় সুষ্ঠু দলীয় সমঝোতা এখনও গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া অত্যন্ত অল্প সময়ে প্রিপারেশন নিতে গিয়ে খেলোয়াড়দের ক্লান্তিই কেবল বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে খেলোয়াড়দের ইনজুরি। নিয়মিত খেলোয়াড় আশীষ ও বাবুল আহত থাকায় আবাহনী পুরোনো দলীয় শক্তি নিয়ে এখনও মাঠে নামতে পারে।

যেহেতু দীর্ঘ সময় ধ'রে লীগ চলবে সেহেতু কোন্ দল কি ফলাফল করবে তা নিশ্চিত ভাবে বলার কোনো উপায় নেই। দীর্ঘ পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত দলীয় এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। 'জেনারেল ট্রেনিং থিউরী এণ্ড কমপিটিশন'-এর 'লফ অব লোডিং'-এ বলা রয়েছে দলীয় ও ব্যক্তিগত 'পিক পারফরমেন্স লেবেল'-এর মান বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। যাহোক, একাশীতে আবাহনী ক্রীড়াচক্র লীগে কি ফলাফল করবে তা এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে দলকে সম্মানজনক পর্যায়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোনো ক্রুটি যে হবে না তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

পুরো দল মাঠে নামাতে পারলে লীগের ফল আমাদের অনুকূলে আসবে ইনশাল্লাহ

শফিক-উজ-জামান

ময়দানের নামী-দামী খেলোয়াড় সংগ্রহের দিক্ দিয়ে বিজে, এম, সি'র পাল্লা নিঃসন্দেহে ভারি এবং সে মানদণ্ডে বিচার করলে বিজে,এম,সি.র অবস্থা ভালো। এ-বছর আমরা ৭ জন নতুন খেলোয়াড় দলে নিয়েছি। কেন না দল থেকে সুহাস, আজমত, স্বপন, হাসান, ও পিন্টু চলে যাওয়ার এ-সংযোজন দলের জন্য অপরিহার্য ছিলো।

ফুটবল দলগত খেলা। এখানে ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলী গৌণ। সুতরাং সমষ্টির দিকে লক্ষ্য

শফিক-উজ জামান

রেখেই এগিয়ে যেতে হয়। তারকা খচিত দল গঠন করলেই যে সাফল্য অনিবার্য এ-ধারণা ভ্রান্ত। দলগত সমঝোতা, লড়িয়ে মনোভাব ও খেলায় জেতার অদম্য বাসনা ইত্যাদি গুণাবলিই একটি দলকে সুসংগত ও শক্তিশালী করতে পারে এবং তা সম্ভব একত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে। সকলের একত্রে অনুশীলন একটি দলের জন্য অপরিহার্য। প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টে আমাদের দশজন খেলোয়াড় আটকে পড়ায় দীর্ঘদিন একত্রে অনুশীলনে বাধার সৃষ্টি হয় এবং এই টুর্ণামেন্টের খেলাতেই বাদল ও হেলাল আঘাত পায়। যার ফল ফেডারেশন কাপ টুর্ণামেন্টে আমরা হাতে-হাতে পেয়েছি। তাছাড়া গোলরক্ষক পিন্টু বছরের গোড়াতেই অনুশীলনকালীন সময় হাঁটুতে চোট পায়। কাজেই এ-পর্যন্ত আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে পারিনি। যার জন্য ফেডারেশন কাপে আমরা পাইনি আশানুরূপ ফল।

গোলকীপার থেকে আউট সাইড লেফট পর্যন্ত প্রতিটি স্থান বিচার করলে আমাদের দলের চেহারা ফুটবল প্রেমিকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পিন্টু নিঃসন্দেহে দেশের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক। গতবছর লীগে ও জাতীয় দলে পিন্টু নিজেকে প্রমাণ করেছে। পিন্টু ছাড়া অতিরিক্ত গোলরক্ষক আছে বহু বছরে অভিজ্ঞ করিম ও নতুন মুখ আতিক। মুকুল, রকিব, বাদল, আমিনুর, আনোয়ার ও সফরুল সমৃদ্ধ রক্ষণভাগ যে কোনো দলের ফরোয়ার্ডদের কাছে সমীহ আদায়ে সক্ষম হবে। তাছাড়া আমি নিজেও আছি। রকিব ও বাদল যথাক্রমে দেশের সেরা লেফট-বাক ও অন্যতম সেরা ষ্টপার। ওদের নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। নতুন দলে ওদের অসুবিধা হবে না। লিংকে পরিশ্রমী কাওসারের সঙ্গে তরুণ কালাম ও হেলাল দলের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেছে। কালাম এবার সকলের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হবে। ফরোয়ার্ডে বাসু, সাথী, লোভন, আসলাম, আমীন ও আসকার যে কোনো দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভীতির কারণ। তাছাড়া "লাকি" গোবিন্দ এখনও সজীব।

মোটকথা পিন্টু, বাদল, হেলাল যদি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আমরা যদি পুরাদল মাঠে নামাতে পারি তাহলে লীগের ফল আমাদের অনুকূলে আসবে ইন্‌শাল্লাহ।

নামী-দামী খেলোয়াড় দলে থাকলেই লীগ-শিরোপা হাতের মুঠোয় আসবে না

গফুর বালুচ

গফুর বালুচ

কেবল নামী-দামী খেলোয়াড় দলে থাকলেই লীগ-শিরোপা হাতের মুঠোয় আসবে আমি এমনটি বিশ্বাস করি না। খেলোয়াড় যারাই থাক প্রাক্টিস হলো মূল বিষয়। যথাযথভাবে প্রাক্টিস করলে সাফল্য হাতের মুঠোয় আসবেই। কাজেই ব্রাদার্সে নামী-দামী খেলোয়াড় আছে ঠিকই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তারা দারুণ কিছু করে ফেলবে এমনটি আশা করার মতো অবস্থা এখনও আমার মনে আসেনি। কারণ প্রাক্টিস করানোর সময় আমি ৭/৮ জনের বেশি খেলোয়াড়কে নিয়মিত পাই না। রেগুলার প্রাক্টিসে উপস্থিত থাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করেও তেমন ফল হয় না। বিভিন্ন অজুহাত তুলে কিছু-কিছু খেলোয়াড় প্রাক্টিসে অনুপস্থিত থাকে। তবে অবস্থার যদি পরিবর্তন হয় তবে ব্রাদার্সের পক্ষে ভালো ফলাফল করা তেমন কষ্টকর হবে না। কারণ ব্রাদার্সে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছাড়াও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় আছে। আর এরা যদি একটু নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে তবে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

এবার খেলোয়াড়দের মাঠের পজিশন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা দরকার। যেমন, আমার দলের একনম্বর গোলকীপার হচ্ছে সান্টু। কিন্তু সে বেশ কিছুদিন যাবৎ আহত। মনে হচ্ছে আরও দিন পনেরো সে মাঠে নামতে পারবে না। কাজেই সান্টুর জায়গায় খেলতে হবে মিন্নুকে। মিন্নু ভালো গোলকিপার ঠিকই, কিন্তু সে একটু খাটো বলে মাঝে-মধ্যে কিছুটা অসুবিধায় পড়ে।

সান্টু এবং মিন্নু ছাড়া আমার দলের অন্য একজন গোলকীপার হচ্ছে আজিজ। ব্রাদার্সের ডিফেন্সে আছে আজমত, সেলিম, টুটুল, বাবু প্রমুখ। এরা সবাই নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডার। এ ছাড়া ডিফেন্সে নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে রজব ও সন্তোষ। আমার দলে লিংকম্যান হিশেবে খেলবে মহসিন, বাবলু, সালাম ও একদম নতুন খেলোয়াড় জাহেদ। তবে এদের প্রয়োজনবোধে আক্রমণভাগেও খেলতে হবে। কারণ আক্রমণভাগে আমাদের খেলোয়াড়ের কিছুটা অভাব রয়েছে। ব্রাদার্সের আক্রমণভাগে খেলবে ওয়াসিম, ফজলু, মানিক (নতুন খেলোয়াড়), কামাল প্রমুখ। এরা ছাড়াও একদম জুনিয়রদের মধ্যে আসলাম, নাসের, নুরু, এবং জাহাঙ্গীরকেও প্রয়োজনবোধে মাঠে নামাতে হতে পারে।

একটি সুষ্ঠু দল গড়ার জন্য যে ধরনের খেলোয়াড় প্রয়োজন সে ধরনের খেলোয়াড় ব্রাদার্সে আছে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু শুধু খেলোয়াড় থাকলেই হবে না, প্রাক্টিস করতে হবে। আসলে প্রাক্টিসটাই হলো মূল জিনিশ।

কিছুটা ভালো ফলাফল করা যাবে, কিন্তু চ্যাম্পিয়নের জন্য ফাইট করা যাবে না

ওয়াজেদ গাজী

রহমতগঞ্জে দু'চারজন নামী-দামী খেলোয়াড় আছে ঠিকই

কিন্তু তবুও খেলোয়াড় সংগ্রহ আমার মনের মতো হয়নি। অবশ্য ক্লাবের কর্মকর্তারা একটি শক্তিশালী দল গড়ার কম চেষ্টা করেননি, কিন্তু দেশে ভালো খেলোয়াড়ের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত থাকায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন রহমতগঞ্জের সংগ্রহ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আজকাল খেলোয়াড়দের দাম বছরে দেড় লাখ, পৌনে দু' লাখে উঠে গেছে। এ-অবস্থায় দল গড়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবু বিজে, এম সি, আবাহনী ও মোহামেডান যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছে তার অর্ধেক টাকাও যদি খরচ করতে পারতাম তবে আমাদের পক্ষে চ্যাম্পিয়নশীপের জন্য ফাইট দেয়া সম্ভব হতো। বর্তমান দল দিয়ে কিছুটা ভালো ফলাফল করা যেতে পারে, কিন্তু চ্যাম্পিয়নশীপের জন্য ফাইট করা যাবে না। নিজের দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে রহমতগঞ্জের কোচ এককালের প্রখ্যাত খেলোয়াড় জনাব ওয়াজেদ গাজী এ-কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এ-টীম নিয়েই হয়তো বড় কিছু করার জন্য আশায় বুক বাঁধতে পারতাম। কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না কয়েকজন খেলোয়াড়ের গাফিলতির দরুন। যে যাই মনে করুক আজ একটু সত্যিকথা বলা দরকার। আমাদের দেশে ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে একজন কোচের চেয়ে লাখ টাকা সংগৃহীত একজন খেলোয়াড়ের গুরুত্ব বেশি। যার জন্য প্রাক্‌টিসে দিনের-পর-দিন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও লাখ টাকার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এ-প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে, গতবছর বিভিন্ন কারণে এনায়েত মোহামেডানের পক্ষে খেলার সুযোগ পায়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলাম এনায়েত এবার অন্তত প্রাক্‌টিসে অত্যধিক মনোযোগী হবে। কিন্তু সে আর হলো কৈ। যাক এবার পুরো টীমের পজিশন সম্পর্কে কিছু বলছি। রহমতগঞ্জে এবার গোলরক্ষক হিশেবে আছে মঈন। তার সম্পর্কে আমি বেশ আশাবাদী। ডিফেন্সে আছে অলোক, নান্নু, মঞ্জু, জনি। এরা আমার মূলশক্তি এবং এদের কাছ থেকে ভালো সার্ভিস পাওয়ার আশা করছি। তবে মঞ্জু হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ায় ক'দিন আগে অপারেশন করা হয়েছে। যার জন্য কয়েকটি গেমে তার পক্ষে মাঠে নামা সম্ভব হবে না। কিন্তু অধিনায়ক মঞ্জুর অনুপস্থিতি দলের জন্য বেশ ক্ষতিকর। মঞ্জুকে ষ্টপার ছাড়াও লিংকে খেলাতে পারতাম। আমাদের ডিফেন্সে লাবু ও বাবু নামে আরও দু'জন খেলোয়াড় আছে, প্রয়োজনে তারাও মাঠে নামবে। আমাদের লিংকম্যান ইউসুফের ওপর ডিপেণ্ড করা যায়। এ-ছাড়া লিংকে নতুন রয়েছে তিনজন খেলোয়াড়—বাবু, জীবন ও জাহাঙ্গীর। তবে ভালোভাবে ফাইট দেয়ার জন্য লিংকে আরো ম্যাচেউরড খেলোয়াড় দরকার ছিলো। রহমতগঞ্জের ষ্ট্রাইকার হিশেবে রয়েছে পুরোনো খেলোয়াড় এনায়েত, হাসান, বাবুল ও সুলতান। এরা ভালোই খেলবে আশা করা যায়। আমার দলের সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে দু' উইং। তবে উইং সচল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার দলের লেফট-উইংগার হচ্ছে লিটন ও রাইট উইংগার হুমায়ুন। তবে কিছুদিন আগে হুমায়ুনের জণ্ডিস হওয়ায় বর্তমানে সে আনফিট।

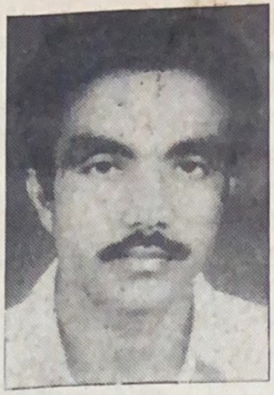

ওয়াজেদ গাজী

সীমিত বাজেট নিয়ে আমাদের দল গড়তে হয়

মোঃ নাজির (ছোট)

অনেকেরই ধারণা সাধারণ বীমা প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে টীম গঠন করে। কিন্তু আসলে এ-ধারণা মোটেও ঠিক নয়। একটা সীমিত বাজেট সামনে রেখে আমাদের খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে হয়। যার জন্য দেশের নামী-দামী খেলোয়াড়দের আমরা দলে টানতে পারি না, আর পারি না বলেই সাধারণ বীমার পক্ষে সম্ভব হয় না চ্যাম্পিয়নশীপের জন্য ফাইট করা।

এবারও আমরা সীমিত বাজেটের মধ্যে দল গঠন করেছি। খেলোয়াড়দের ভাতা অবিশ্বাস্যহারে বেড়ে যাওয়ায় 'নামী দামীদের' দলে টানতে পারিনি। তবে আমাদের দলে কিছু তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় রয়েছে যাদের খেলা সহজেই ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে কিছু অত্যন্ত নতুন ও আনাকোরা খেলোয়াড়, যাদের ঘষে-মেজে ঠিক-ঠাক করে মাঠে নামাচ্ছি। অবশ্য একটা সুষ্ঠু দল গঠনের জন্য যে পরিমাণ সময়ের দরকার তার অর্ধেক সময়ও আমরা পাইনি। কাজেই সীমিত সময়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে দলগত সমঝোতা গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবুও আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এবং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও ফুটবল সম্পাদক জনাব নূরুল আমিনের সহায়তায় সাধারণ বীমাকে একটি ভালো দল হিশেবে দাঁড় করানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি আমাদের চেষ্টা সফল হবে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সাধারণ বীমা এবারই প্রথম একটা ব্যালান্সড টীম হিশেবে মাঠে নামতে পারছে। এ-ছাড়া আমার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়রা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় যত্নবান। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই লীগে আমরা ভালো ফলাফল আশা করছি।

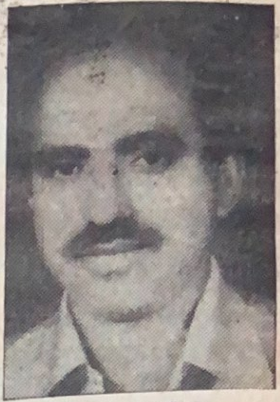

মোঃ নাজির

সপ্তাহের খবর

২৯শে মে '৮১ শুক্রবার

গত ২৮শে মে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা বলেন, সংবাদপত্র জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এই নির্ভীক সাংবাদিকের লেখা গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষায় এদেশের জনগণকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে।

ইত্তেফাক প্রকাশনা গ্রুপের সহযোগিতায় মানিক মিয়া ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে এই গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল ওয়াহাব, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, আহমেদ হুমায়ুন, অধ্যাপক কিউ, এ আই, এম, নুরুদ্দীন, মুহাম্মদ আসাফ-উদ দৌলা, আবদুল হাফিজ, মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৮শে মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরলোকগত শিল্পাচার্যের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৩০শে মে '৮১ শনিবার

গত ২৯শে মে সিলেটে অপরাহ্লে প্রবল বৃষ্টিপাত ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভায় দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে আয়োজিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের স্থানীয় জেলা শাখার সভাপতি আবদুর রহিম। দলের প্রেসিডিয়ামের সদস্য বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, আবদুস সামাদ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, যুগ্মসম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরী এবং দলীয় সংসদ সদস্য এনামুল হক চৌধুরী।

প্রবল বৃষ্টির দরুন জনসভা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে হয়। তবে আনুমানিক প্রায় তিন লাখ শ্রোতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজে বক্তৃতা শোনেন।

৩১শে মে '৮১ রোববার

গত ৩০শে মে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান খুব সকালে নিহত হয়েছেন (ইন্না লিল্লাহে ……রাজেউন)। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিশেবে পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সংবিধান বলবৎ থাকবে এবং জাতীয় সংসদ স্বাভাবিকভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে ৪০দিনব্যাপী জাতীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেন। এ সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

বাসস জানায়, গত ৩০শে মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এদিন ভোররাতে, চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রপতি হিশেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সংবিধানের ১৪১(ক)(১) অনুচ্ছেদের আওতায় জরুরি অবস্থা ঘোষণাকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে 'মারাত্মক জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগে বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।'

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এক সরকারী নির্দেশে সংবিধানের আওতায় কতিপয় মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১-খ ধারায় ১ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করেন যে, সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ও ৪৩ নং ধারায় প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো লোক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না। এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে ১৪১ (ক) (১) অনুচ্ছেদের অধীনে জারিকৃত এই জরুরি ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন এই অধিকার আদায়ের জন্য ইতিমধ্যে কোনো

গত ২৮শে মে শিশু একাডেমীতে মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) রচিত 'পাকিস্তানী রাজনীতির [বিশ বছর' পুস্তকের প্রকাশনা উৎসবে বক্তৃতা দিচ্ছেন সৈয়দ আলী আহসান

আদালতে দায়েরকৃত মামলার শুনানিও স্থগিত থাকবে। যে সমস্ত মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো হলো : আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার, আইনের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার এবং গ্রেফতার ও আটক থেকে নিরাপত্তা।

১লা জুন '৮১ সোমবার

গত ৩১শে মে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গায়েবানা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন মুসলিম দূতাবাসের কূটনৈতিকরা, সরকারী ও বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দসহ হাজার-হাজার লোক গায়েবানা নামাজে জানাজায় অংশ নেন। নামাজে জানাজার পর একটি শোক মিছিলও বের হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণমানুষের রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক স্বস্তি ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আপোষহীনভাবে লেখনী চালনা করে যে নির্ভীক সাংবাদিক এ জাতির ইতিহাসে আপন অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন আজ সাংবাদিকতার সেই মহান পথিকৃৎ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী। যথাযোগ্য মর্যদায় মানিক মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য বিভিন্ন সংগঠনণ ও প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান) দিবসটি পালনের জন্য দলের সব শাখার প্রতি আহ্বান জানায়। দিনটি পালনের জন্যে ডেমোক্রেটিক লীগও সব শাখার প্রতি আহ্বান জানায়। এ ছাড়া, জাতীয় জনতা পার্টি মানিক মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

মরহুমের মাজারে ভোর ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কোরানখানি, সকাল ৮টায় মিলাদ ও রুহের মাগফেরাত কামনা ক'রে মোনাজাত এবং মরহুমের ধানমণ্ডির বাসভবনে ভোর ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কোরানখানি ও বেলা ১টা মিলাদ ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

২রা জুন '৮১ মঙ্গলবার

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার বলেছেন যে-কোনো মূল্যে গণতন্ত্রের সংরক্ষণ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার যে-কোনো চক্রান্ত প্রতিহত করতে জাতি আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১লা জুন জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা ক'রে অপরাধীদল দেশকে যে দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো তার মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে বিচারপতি সাত্তার বলেন : তারা সাংবিধানিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছে তা তাদের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

৩রা জুন '৮১ বুধবার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদীখান থানার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) ইদ্রিস বীরবিক্রম প্রকাশ্য দিবালোকে গুলীতে নিহত হয়েছেন। তাঁর সাথে নৌকার একজন মাঝিও নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান উপরোক্ত তথ্য জানান। তিনি অভিযোগ করেন, বজলু লস্কর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। এর আগেও কয়েকবার উক্ত বজলু লস্কর বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) ইদ্রিসকে হত্যার চেষ্টা করেছে। ২/৩ মাস আগে সে কুড়াল দিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্যাপ্টেন (অবঃ) ইদ্রিস ৭ নং সেক্টরে লেঃ কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন।

৪ঠা জুন '৮১ বৃহস্পতিবার

গত ৩ জুন ১৬টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ‘আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ এক চরম সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আগ্রাসন এবং অতীতের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও নৈরাজ্য এই সংকটের জন্য মূলত দায়ী। গত ৩০শে মে চট্টগ্রামে সংঘটিত রাষ্ট্রপতির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড বিরাজমান সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আজ গোটা জাতি গভীর উদ্বিগ্ন।’

আমরা মনে করি, আজ যখন দক্ষিণ তালপট্টিতে ভারতীয় পতাকা উড়ছে যখন বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে ভারতীয় রণপোত মোতায়ন রয়েছে, যখন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জনগণ উদ্বিগ্ন তখন এই সমস্যা উত্তরণের একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং তা হচ্ছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সৃষ্টিশীল চেতনা। এ-জন্য আমরা মনে করি, ‘আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ওপর আগ্রাসনের বিপদকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে। এবং জনগণের চেতনাকে শাণিত করার জন্য অবাধ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগকে সম্প্রসারিত করে দিতে হবে।’

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক আহমাদ, বিচারপতি বি,এ সিদ্দিকী, কাজী জাফর আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, মওলানা আবদুর রহিম, মীর্জা নূরুল হুদা, টি, আলী, নূরুর রহমান, আমেনা বেগম, আবু নাসের খান ভাসানী, মওলানা আবদুল মতিন, সফিউল আলম প্রধান, ফরমানউল্লাহ খান, নগেন সরকার ও নূরুল হক মেহেদী।

অপর মানচিত্র

থাইল্যাণ্ড

রাজধানী : ব্যাংকক

আয়তন : ১,৯৮,৪৫৫ বর্গমাইল
৪৭'২৪°/. চাষাবাদযোগ্য
৩২°/. বনাঞ্চল

মুদ্রা : বাহ্থ

শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক : ৮০°/.

জনসংখ্যা . ৩,৫২,০০,০০০

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ২২২'৫২ জন প্রতিমাইলে। (এর মধ্যে ৪৪'৯°/. ১৫ বছরের কম বয়সী)
৬০,০০,০০০ চীনা
১৩,০০,০০০ মালয়, পাহাড়ী উপজাতি এবং ভিয়েতনামী।

জন্মহার : প্রতি ১০০০ জনে ৩৪'৬৫

মৃত্যুহার : প্রতি ১০০০ জনে ৮'২৯

আয়ুকাল : ৫০ বছর ৬ মাস পুরুষ
৪৯ বছর ৪ মাস মহিলা

বিশ্ববিদ্যালয় : ১২টি

টেকনিক্যাল ইনসটিটিউট ৭টি।

কলেজ : ২৫টি

ছাত্রসংখ্যা : ১৫,০৭,০০০ সেকেণ্ডারী
৭৩,৮০,০০০ প্রাইমারী

কর্মরত জনসংখ্যা : ১,৮৬,০০,০০০

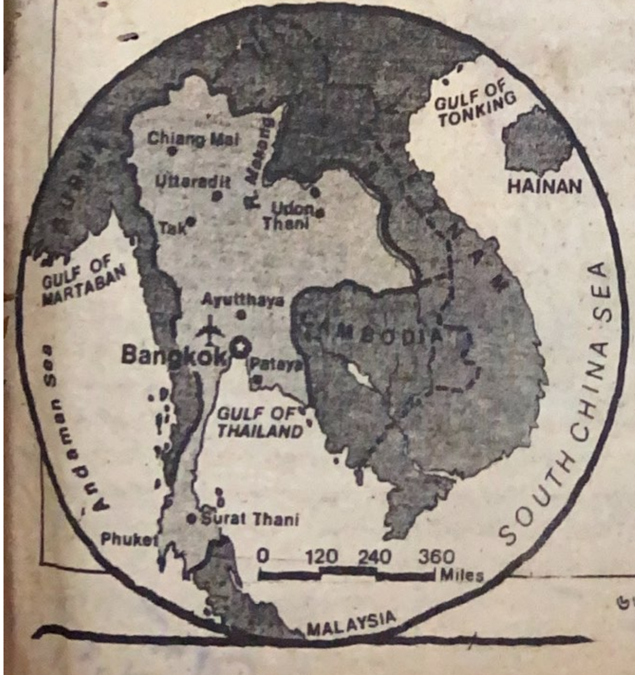
GULF OF TONKING
Chiang Mai
Mekong
Uttaradit
Udon Thani
Tak
HAINAN
BURMA
GULF OF MARTABAN
Ayutthaya
Bangkok
Pataya
MBODIA
GULF OF THAILAND
Andaman Sea
SOUTH CHINA SEA
Surat Thani
Phuket
0 120 240 360 Miles
MALAYSIA

এর মধ্যে ১৪'৮°/. ব্যবসা এবং চাকরি,
৬'৪°/. ম্যানুফ্যাকচারিং
৭৪'৯°/. কৃষি এবং মৎস্য চাষ,
৪'২°/, সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে কর্মরত।

যোগাযোগ : ১,৯১,৬৩৫টি প্রাইভেট কার
৭৬,১৬৩টি ট্রাক এবং বাস
৯৮,৯৫৪টি মোটর সাইকেল

রেলপথের দৈর্ঘ্য : ২২৪৮ মাইল

সড়কপথের দৈর্ঘ্য : ১২,৪৮২ মাইল

রেলওয়ে ইঞ্জিনের সংখ্যা : ২৮৫টি

প্রধান সমুদ্রবন্দর : ব্যাংকক, সাত্তাহিপ

টেলিভিশন গ্রাহক : ১৪,০০,০০০ জন

রেডিও গ্রাহক : ৫৯, ৩০,০০০ জন

টেলিফোনের সংখ্যা : ৪,০৯, ১৫৬টি

এয়ারলাইন : থাই ইন্টারন্যাশনাল।

জাতীয় উৎপাদন : ১৯৭৭-এ ১৮'১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জাতীয় বাজেট : ১৯৭৭·এ ২'৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

মাথাপিছু মাসিক আয় : ৪৮২ মার্কিন ডলার।

ব্যয় : প্রতিরক্ষা খাতে ৪°/. GNP
শিক্ষাখাতে ১৬°/.

উৎপাদন : কৃষি ২৭°/. GNP
শিল্প ২০°/. GNP

উৎপাদিত দ্রব্য : থাইল্যাণ্ডের প্রধান অংশ বনাঞ্চল। আর এর টিক্ উড বিশ্ববিখ্যাত। এছাড়াও চাল, রাবার, টিন, নারিকেল, তামাক, বাদাম, সয়াবিন, তুলো প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

শিল্প উৎপাদন : ওষুধপত্র, কাপড়, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রভৃতি।

খনিজ সম্পদ : লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যান্টিমোনি, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি।

ধর্ম : ৯৪°/. বৌদ্ধ, মোট জনসংখ্যার ১৫ লাখ মুসলমান এবং বাকি কিছু খ্রীষ্টান, হিন্দু, এবং কনফুসিয়ান।

রাষ্ট্রপ্রধান : রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজ
প্রধানমন্ত্রী প্রেম তিনসুলান্দ

প্রধান দিন : ন্যাশনাল ডে—৫ই ডিসেম্বর

মোট জাতীয় আয় : ২১'৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় : ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

সেনাবাহিনীর মোট সদস্য : ২,১৬,০০০ জন

স্থলবাহিনীর মোট সদস্য : ১,৪৫,০০০ জন

নৌবাহিনীর মোট সদস্য : ২৪,০০০ জন

বিমানবাহিনীর মোট সদস্য : ৪৩,০০০ জন

জঙ্গী বিমানের সংখ্যা : ১১৬৮টি।

কৌশিক আহমেদ

মুস্তাফার মজলিশ

এবারে এমন কিছু লিখবো ঠিক করেছিলাম, যাতে পাঠক একটু হাসতে পারে, একটু রিল্যাক্স করতে পারে।

কিন্তু হলো না। পারলাম না। হাসাতে পারলাম না। রিল্যাক্স করাতে পারলাম না। সমস্ত দেশটা কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে। সমস্ত জাতি ভীষণ টেন্স এখন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত।

রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা রূপ যুপকাষ্ঠে আরো একটি নির্মম বলিদান।

মোগল আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে বিনা রক্তপাতে রাজা বা সরকার পরিবর্তনের ঘটনা খুব কমই আছে। এ রকম আর কতদিন চলবে কে জানে। কিন্তু আমরা এ চাইনা। আমরা যারা অ-রাজনৈতিক সাধারণ মানুষ আমরা চাই যে, আমার সন্তান দুধে ভাতে যদি নাও পারে অন্ততঃ নুনে ভাতে যেন থাকতে পারে।

সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে এই একটি জিনিসই চেয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে চিরকাল ধরে রাজনৈতিক নায়করা এই একটা জিনিস-ই দেশকে দিতে পারেন নি। ক'জন সত্যিই চেষ্টা করেছেন, সেটাও অবশ্য ভেবে দেখা দরকার।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং রাজনৈতিক হত্যা দুটোই সমান নিন্দনীয়। তবে অনীহা যখন জড়তার পর্যায়ে চলে যায় তখন প্রচণ্ড আঘাত না এলে সত্তা সজাগ হয় না।

আর সজাগ হয় না বলেই 'দুলাল-আবদুর রহমান'দের মত অনেক মৃত্যু একটু গুঞ্জন তোলে মাত্র।

আমি আসা করি এইবার বজ্রাঘাতের পর অন্ততঃ সমগ্র জাতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। রুখে উঠে বলবে যে, আর অর্থহীন হত্যা হতে দেয়া হবে না।

সত্যিই এই রকম অহেতুক রক্তপাত এখন রক্তে আগুন জ্বালায়। এই কি চলতে থাকবে! তার চেয়ে, আর যাতে এই রকম রক্তপাত না হয়, তার জন্য একটা বড় রকম রক্তদান একবারে হয়ে যাক।

মৃত্যুস্নানে সূচী হোক ধরা।

রাষ্ট্রপতির শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার বিনম্র সহমর্মিতা জানাই।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি
লুক প্রসাধনীর শ্রদ্ধার্ঘ

[illegible]

লুক প্রসাধনীর

[illegible]

Regd. No. DA-445 ROBBAR Vol. III Sunday 1981 Price Tk. 4·00

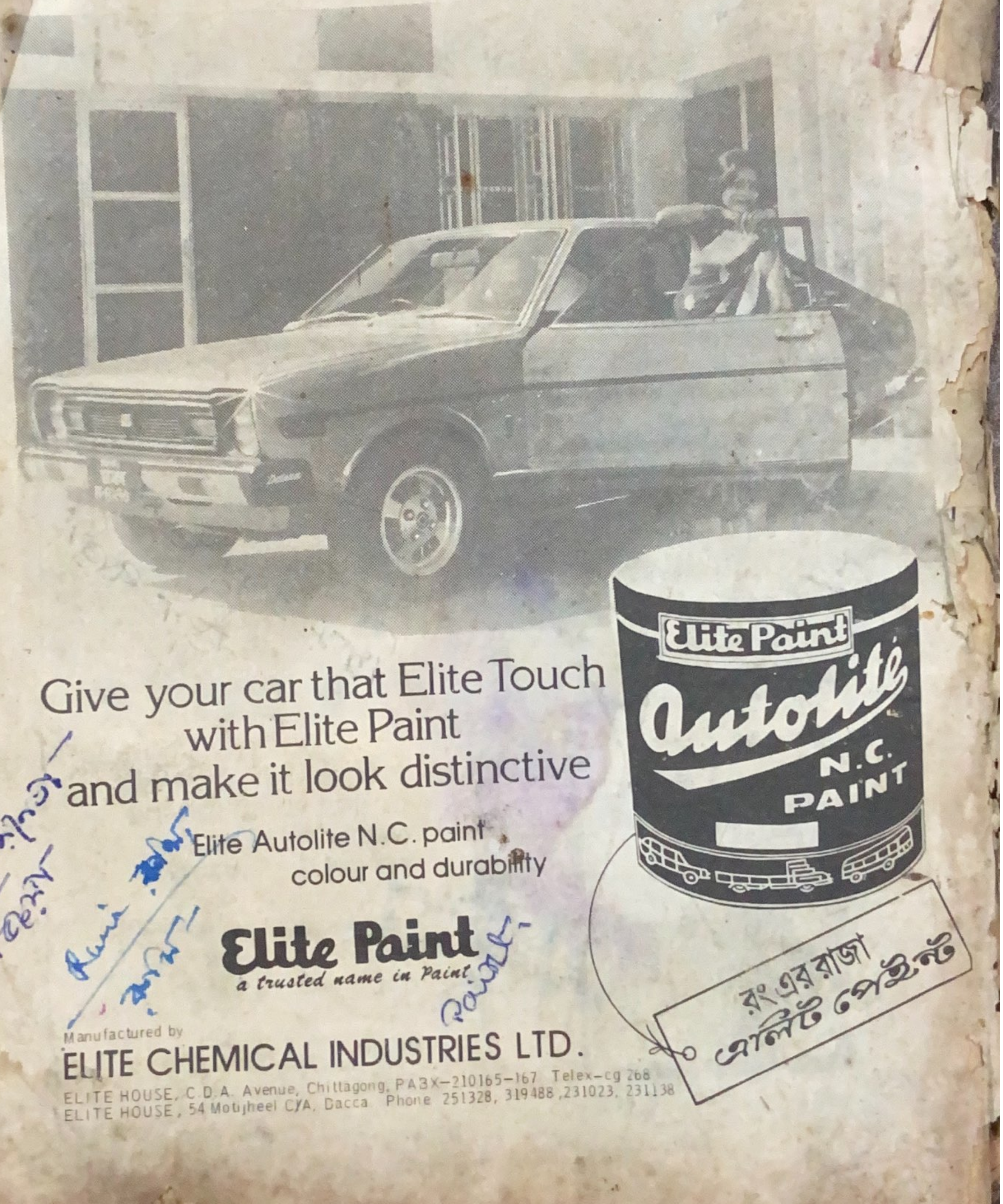
Elite Paint
Autolite
N.C.
PAINT
রং এর রাজা
এলিট পেইন্ট

Give your car that Elite Touch
with Elite Paint
and make it look distinctive

Elite Autolite N.C. paint
colour and durability

Elite Paint
a trusted name in Paint

Manufactured by
ELITE CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
ELITE HOUSE, C.D.A. Avenue, Chittagong, PABX—210165-167 Telex—cg 268
ELITE HOUSE, 54 Motijheel C/A, Dacca Phone 251328, 319488, 231023, 231138